ইতিহাসচর্চা

আদিমধ্য যুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে আজকে আমরা যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পুনর্গঠন ও সমুন্নতির কাজ শুরু করেছি তা গত প্রায় তেরশো বছরের ইতিহাস। একথা সত্য, এযুগে বিজ্ঞানভিত্তিক মননশীল, যুক্তিবাদী, আত্মসমীক্ষামূলক ইতিহাসচর্চা আদিমধ্য যুগের ঐতিহাসিকদের অজানা ছিল। কিন্তু আদিমধ্য যুগ ও মধ্যযুগের ঐতিহাসিকগণই আধুনিক ইতিহাসচর্চার ভিত্তি ও কাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে পথিকৃৎ ছিলেন। এই আধুনিক ইতিহাসচর্চার সমুন্নতিতে বিভিন্ন জাতির ঐতিহাসিকদের অবদান অনস্বীকার্য। আদিমধ্য যুগের ঐতিহাসিকদের কাছে আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে আমরা ঋণী।

তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ কোম্পানির শাসনের প্রথম পর্বে আমলাতন্ত্রই এদেশে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের মুখ্য অবয়ব হিসাবে গড়ে উঠেছিল। এই 'মডেল' বা আকারটি যেমন ইংরেজ রাজশক্তির বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছিল, তেমনি আধুনিক ইতিহাসচর্চার সূচনা হয় এরই মাধ্যমে। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে আধুনিক ইতিহাসচর্চার জন্ম হয়েছিল ইংরেজের আমলাতান্ত্রিক সূতিকাগার থেকে। এই ইতিহাসচর্চার জন্মের পর থেকেই সে লালিত-পালিত হতে থাকে ঔপনিবেশিক

Scanned with CamScanner

শাসনদণ্ডকে আশ্রয় করে। উনিশ শতকে ভারতীয় ইতিহাসবিদদের মধ্যে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে যে বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণ, বৌদ্ধিক অনুসন্ধিৎসার সূচনা হয় তার ফলেই ভারতবর্ষে আধুনিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে তত্ত্ব ও নিয়মবিদ্যার আবির্ভাব ঘটে। তবে ৭০০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে ভারতবর্ষের ইতিহাসচর্চার অনেক উপকরণ ও তথ্য থাকা সত্ত্বেও বিদ্যা ও নিয়মের অভাবে বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক গ্রন্থের সম্পূর্ণ অভাব দেখা যায়। কর্নেল টড্, আরবীয় পণ্ডিত আলবেরুনি, ফ্লিট প্রমুখ বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ ভারতীয় ইতিহাসচর্চার এই দৈন্যের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। আবার একদল ঐতিহাসিক মনে করেন খ্রিস্টপূর্ব ভারতবর্ষে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক অভিযান হয়নি বলেই ভারতীয়দের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসচর্চার প্রবণতা জাগ্রত হয়নি। গ্রিসে পারসিক অভিযান প্রতিহত হলে হেরোডোটাস যেভাবে ইতিহাসচর্চায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তেমন ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়নি। আবার যথার্থ ঘটনা ও জনশ্রুতির মধ্যে পার্থক্যজ্ঞানের অভাব থাকায় ভারতীয়গণ বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস লেখার প্রণালী সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। এটা যথার্থ যে হেরোডোটাস বা থুকিডিডিসের মতো ঐতিহাসিক ভারতে জন্মগ্রহণ করেননি বা তাঁদের মতো ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে তেমন কেউই অবদান বা দৃষ্টান্ত রাখতে সমর্থ হননি কিন্তু ভারতীয়রা একেবারে এযুগে ইতিহাসচর্চা করেননি তা বলা যায় না। তবে প্রাচ্যবাদীরা যে ইতিহাসচর্চা আমাদের মনে জাগ্রত করেছিল তার ফলে ভারতীয় ধ্যানধারণা ও চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে পাশ্চাত্য রীতিনীতি, তত্ত্ব ও তথ্য, পদ্ধতি ও কলাকৌশল আয়ত্ত করে সেগুলিকে ভারতের প্রাচীন গ্রন্থ, ঐতিহাসিক তথ্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলিকে নিবিড়ভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ, পরীক্ষা ও ব্যাখ্যা, প্রয়োগ করতে শিখিয়েছিল। তার ধারা ব্রিটিশ প্রাচ্যবাদের অংশ হিসাবে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য ও অনুসন্ধানের ফলে এযুগে ভারতবর্ষের ইতিহাসচর্চার সম্পর্কে এমন সব অসংখ্য তথ্য ও প্রমাণ পাওয়া গেছে যা ইতিপূর্বে কখনও সম্ভব হয়নি। অসংখ্য মৌলিক ঐতিহাসিক সাক্ষ্য ও উপাদানের সাহায্যে আদিমধ্য যুগের ভারতের ইতিহাস নতুনভাবে লেখা হয়েছে। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর বিখ্যাত *Historiography of Modern India* নামক গ্রন্থে বলেছেন যে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের প্রভাবে ইওরোপীয় আদর্শের রীতিনীতি পদ্ধতির দ্বারা প্রাচীন ও আদিমধ্য যুগের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন পদ্ধতির পথ নির্মিত হয়। ইওরোপীয় লেখকদের কাছ থেকেই ভারতীয় ঐতিহাসিকরা কলাকৌশল, ধারণা, ব্যাখ্যা, তথ্য ও তত্ত্ব, নিয়মবিজ্ঞান, ইতিহাসদর্শন এবং পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। আবার কিছু ইংরেজ ঐতিহাসিক ভারত ইতিহাস সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করায় ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ইতিহাস চেতনাকে নতুন পদ্ধতির সাথে অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ করে।

Scanned with CamScanner

ভারতে ইতিহাসচর্চার আবির্ভাব মূলত আধুনিককালে ঘটলেও আদিমধ্য যুগে ইতিহাসচর্চা একেবারে ছিল না তা বলা যায় না। বিশেষ করে ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত ঘটে বাণভট্টের *হর্ষচরিত* ও দ্বাদশ শতাব্দীর লেখা কলহণের *রাজতরঙ্গিণীতে*। অবশ্য বাণভট্ট হর্ষবর্ধনের চরম গুণগ্রাহী হওয়ায় তাঁর গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক দিকটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই অনেকে মনে করেন হর্ষচরিত ইতিহাসের মতো হলেও যথার্থ অর্থে ইতিহাস নয়। ড. মজুমদারও মন্তব্য করেছেন হর্ষচরিত ইতিহাসচর্চার যোগ্যতা দাবি করতে পারে না। তবে জীবনী গ্রন্থগুলির মধ্যে হর্ষচরিত নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক তথ্যে সমৃদ্ধ। অবশ্য আরও অনেক ঐতিহাসিক গ্রন্থ যে নেই তা নয়। আলোচনার সুবিধার্থে অন্তত আদিমধ্য যুগের সংস্কৃত ভাষায় কলহণের লেখা গ্রন্থ *রাজতরঙ্গিণীতে* তিনি ১১৪৮-৪৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যে ইতিহাসচর্চা আধুনিক মন নিয়ে করেছেন তার ছাপ স্পষ্ট। প্রথমত কলহণের নিয়মবিদ্যা অজানা ছিল তা বলা যায় না। এমনকি আধুনিক ইতিহাসচর্চার ধ্যানধারণা ও পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিল। ঐতিহাসিক কেমন হবেন তারও ইঙ্গিত কলহণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন একজন ঐতিহাসিককে বিচারকের আসনে বসতে হবে এবং তাঁকে সবকিছু মুক্ত মন দিয়ে বিচার করতে হবে। এমনকি তাঁর সমালোচনামূলক মানসিকতা ছিল। তিনি তাঁর পূর্বসূরির রচনা বিচার বিবেচনা করে তবেই গ্রহণ করেছেন। তিনি লিপির উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এইদিক বিচার করলে বলা যায় এই যুগে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে কলহণ বিস্ময়কর চিন্তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। *রাজতরঙ্গিণী* যথার্থ অর্থেই প্রথম একটি আধুনিক ইতিহাসচর্চার গ্রন্থের মর্যাদা দাবি করতে পারে। আধুনিক ইতিহাসচর্চার মানদণ্ডে *রাজতরঙ্গিণী* উত্তীর্ণ বলা যায়। কলহণ এই গ্রন্থে ইতিহাস রচনায় যে পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন আদিমধ্য যুগের কোনো হিন্দু ঐতিহাসিক তা করতে পারেননি।

প্রাচীন ভারতে 'ঘটনাপঞ্জি' রচনার যথেষ্ট প্রবণতা ছিল। এইরকম ঘটনাপঞ্জি থেকেই কলহণ ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। এগুলি হল নেপালি বংশতালিকা, পুরাণে উল্লিখিত বংশতালিকার অনুরূপ। সিন্ধু দেশেও অনুরূপ ঘটনাপঞ্জির উপর ভিত্তি করেই আরবি ঐতিহাসিক *চাচনামা* লিখেছিলেন। আসামের বুরুঞ্জিও এই ধরনের ঘটনাপঞ্জি। প্রাচীন ভারতে এই ঘটনাপঞ্জি লেখার একটা পদ্ধতি ছিল। ইতিহাসের সমগোত্রীয় আর এক ধরনের গ্রন্থ, প্রাচীন ভারতে রচিত হয়েছিল—এগুলি প্রবন্ধ বা Narratives নামে অভিহিত। এরকমই একটি গ্রন্থ মেরুতুঙ্গ রচিত *প্রবন্ধ চিন্তামণি* উল্লেখযোগ্য। তাই বলা যায় প্রাচীন ও আদিমধ্য যুগে ভারতবর্ষে ইতিহাসচর্চা ছিল কিন্তু আধুনিক ইতিহাসচর্চার নিয়ম ও প্রণালী জানা ছিল না।

প্রকৃতপক্ষে History শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ Istoria অথবা লাতিন শব্দ historia থেকে যার অর্থ কোনো ঘটনা যথার্থ অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা। ইতিহাসের

Scanned with CamScanner

চর্চা ও আদর্শ যুগে যুগে, দেশে দেশে এবং সময়ে সময়ে, লেখকে লেখকে পরিবর্তনশীল দেখা যায়। ভারতবর্ষে অবশ্য ৬০০-১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যের সময়কালে ইতিহাসের ধারণা আধুনিককালের বিজ্ঞানসম্মত, মানবিক, যুক্তিসম্মত, আত্মসমীক্ষামূলক ও সমালোচনামূলক ইতিহাসচর্চা বা যথার্থ অনুসন্ধানের মাধ্যমে কোনো ঘটনা জানার মানসিকতা তৈরি হয়নি। ইতিহাস একদিকে বিজ্ঞান কারণ ইতিহাস ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান ও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। ইতিহাস আবার মানবিক, কারণ অতীতে মানুষ মানুষের ওপর যে শোষণ ও অত্যাচার করেছে তারও যথাযথ পরিচয় বহন করে। ইতিহাস যুক্তিনির্ভর, কারণ সাক্ষ্যানুযায়ী বিশদ ব্যাখ্যার দিকে অগ্রসর হয়। আবার এটি আত্মসমীক্ষামূলক, কারণ ইতিহাসের উদ্দেশ্য মানুষ নিজেকে জানতে চায় এবং ইতিহাস এই শিক্ষা দেয় মানুষ কে এবং কী করেছে। মানুষ সব কিছু জানতে চায়, দূরকে নিকট করতে চায়। সে নিজেকে জানতে চায়—শুধুমাত্র তার দৈহিক স্বভাব নয়, তার মনকে জানতে চায়, তাই ইতিহাস মানবিক। Collingwood তাঁর *Ideas of History* গ্রন্থে বলেছেন "History is the re-enactment of past experience. The result of enquiry must be told in a manner that appeals to men. It must be readable." স্বভাবতই এই দিক হতে বিচার করলে ইতিহাস সাহিত্য ও দর্শন হতে বিচ্যুত হতে পারে না। এখানে রীতির বা শৈলীর একটা প্রশ্ন ওঠে। অধিকন্তু ইতিহাস শুধুমাত্র রাজা, মন্ত্রী, যুদ্ধ ও রক্তপাতের গল্পই ইতিহাস নয়, ইতিহাস হল মানুষের সুখ-দুঃখ ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন পর্যায়ের ঘটনার বিন্যাস। ইতিহাস শুধুমাত্র রাজনৈতিক ঘটনার ইতিহাস নয়। Collingwood-এর ভাষায় বলা যায় "It has to be scientific and critical—interperative of the society and culture of the people."

এখন আমরা এই পরিপ্রেক্ষিতে আদিমধ্য যুগের ও মধ্যযুগের (৬০০-১৭৫০ খ্রিস্টাব্দ) ইতিহাসচর্চাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করব? তখন ইতিহাসের ধারণাই বা কেমন ছিল? তখন ভারতীয়দেরই বা ইতিহাস সম্পর্কে কী মনোভাব ছিল এবং এযুগের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁরা কী ধারণা পোষণ করতেন? Collingwood-এর মতে "Medieval Indian Historiography was not wholly a continuation of ancient Indian conceptions of History as Medieval European History was in a way a continuation of Hellenistic and Roman historiography." ভারতবর্ষে আরবীয়দের আগমন এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কিদের শাসনক্ষমতা অধিকার ভারতবর্ষের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করে। এর ফলে মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এবং সমাজব্যবস্থায় শ্রেণী বিভাজনের সূচনা হয়। এতদিন ভারতবর্ষের ইতিহাসচর্চায় ভারতীয়দের ইতিহাসচর্চার যে বিস্তৃত ধারণা ছিল তা ইতিহাস বা ইতি + হাস—এই ধারণার

Scanned with CamScanner

মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আরবীয়রা ভারতবর্ষে উন্নতমানের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন পর্বের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন।

৫৭০ খ্রিস্টাব্দে হজরত মহম্মদের জন্মের পর থেকেই আরবীয়দের মধ্যে ইতিহাস রচনার ধারণা গড়ে উঠেছিল। গোড়ার দিকে অর্থাৎ আরবীয়দের সিন্ধু অভিযানের সময় থেকে আরবি ভাষা ছিল ইতিহাস রচনার বাহন। তারপর দশম শতাব্দী হতে ইতিহাসের ভাষা হয় পারসিক ভাষা। পারসিক ঐতিহ্যে ইতিহাস লেখার প্রণালী-সমৃদ্ধ ইতিহাসচর্চার ভাবধারা ভারতবর্ষে প্রবর্তন তুর্কিদের এক গৌরবময় অবদান। তুর্কিরা যেভাবে নতুন ধারায় ইতিহাসচর্চা শুরু করে তাতে সামগ্রিকভাবে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসচর্চার দৈন্যকে বিস্তৃতভাবে তুলে ধরে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে তুর্কিরা এক নতুন উপাদান যুক্ত করে তা হল ঐতিহাসিক সাহিত্য। তাই জে. এন. সরকার মন্তব্য করেছেন, "Muslim historiography was indeed a novel gift of the Persianised Turks to contemporary Indian culture. It will be quite time to say that the Turks introduced historiography as a form of culture into India." ইংরেজ ঐতিহাসিক ডড্ওয়েলও *The Advent of Islam*-এ লিখেছেন "begins a great series of Indian chronicles whereas Hindu History is a matter of archaeology, scrapy and almost incoherent, Muslim history possesses a wealth of documents which render it, if not complete at least intelligible...But the Muslim chronicles are far superior to our own (English) chronicles. They are written for the most part not by monks but by men of affairs, often by contemporaries who had been taken part in the events they recount... the Muslim period is one of the vivid living men whereas the Hindu period is one of the shadows." আরবীয় ইতিহাসচর্চা ভারতীয় নরপতি ও লেখকদের নিকট অনুসরণ করার মতো একটা ছাঁচ বা আদর্শ স্থাপন করে। আরবীয় ইতিহাসচর্চা ছিল সঠিক কালানুক্রম ও সঠিক সন-তারিখের দিক থেকে যথাযথ।

হজরত মহম্মদের আবির্ভাবের সময় থেকেই ইতিহাসচর্চা আরবীয়গণের মধ্যে সূচনা হয়। ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে আরবীয়দের এক গৌরবময় ভূমিকা আছে। মধ্যযুগের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে দুটি ধারা স্পষ্টভাবে দেখা যায়। প্রথমদিকে আরবি ভাষাকে এবং দিল্লির সুলতানরা ও মুঘলরা ভারতবর্ষে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে পারসিক ভাষাকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। আরবদের সিন্ধু অভিযান (৭১২ খ্রিস্টাব্দ) হতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ হাজার বছরের ইতিহাসচর্চায় অজস্র ধারায় মধ্যযুগের ঐতিহাসিকগণ ইতিহাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এই হাজার বছরের ইতিহাসচর্চার বিবর্তনে অনেক প্রভাব কাজ করেছে। ভারতে মধ্যযুগের ইতিহাসচর্চা

Scanned with CamScanner

(Historiography) সম্বন্ধে খুব কমই আলোচনা হয়েছে। ইলিয়ট ও ডসন এবং তাঁদের পরবর্তী ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ মধ্যযুগের ইতিহাস লিখতে গিয়ে পারসিক ইতিহাস গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত আলোচনা দেখা যায়। পারসিক ইতিহাসচর্চা সম্বন্ধে ধারাবাহিক ও সুষ্ঠু আলোচনা দেখা যায় Peter Hardy-র *Historians of Medieval India* (London 1960) নামে এক ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থে। মুসলিম ইতিহাস-সাহিত্যের এক বিশাল অংশ জুড়ে আছে জীবনচরিত জাতীয় ইতিহাস। ইতিহাস শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আলোচ্য ঐতিহাসিকদের জীবন চরিতের প্রতি গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। ইতিহাস সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যও খুব বেশি ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। অবশ্য ঐতিহাসিকদের ব্যক্তিগত জীবনকে উপেক্ষা করা যায় না, বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে কাঠামোগত ও তত্ত্বাদর্শগত সামঞ্জস্য আছে। এই সামঞ্জস্যের সূত্র ধরে এবং ঐতিহাসিকদের পরিবেশ, ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতার প্রতি দৃষ্টি রেখে ইতিহাসের তত্ত্ব, দর্শন, পদ্ধতি ও রূপ সম্বন্ধে আলোচনা সম্ভব। মধ্যযুগে ভারতীয় ইতিহাসচর্চায় অনেক সমস্যা আছে। তার মধ্যে কালবিভাজন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। মধ্যযুগের প্রাথমিক পর্বে ও মধ্যযুগের ঐতিহাসিকদের ইতিহাস বিদ্যার কলাকৌশল, প্রেরণা, দর্শন ও পদ্ধতির উৎস ছিল আরবীয় ও পারসিক ইতিহাস রচনার ধারা। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেও আরবি ইতিহাসবিদ্যা ব্যাপকতা লাভ করেছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পর রাজনৈতিক ঘটনা ছাড়াও ইতিহাসে স্থান পেয়েছিল সমাজ, ধর্ম ও মানুষের কথা এবং দেশের কথা। কিন্তু পারসিক ইতিহাসচর্চা ছিল অনেক সংকীর্ণ। পারসিক ইতিহাসচর্চা ছিল সীমাবদ্ধ রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায়। কিন্তু আরবীয় ঐতিহাসিকরা ছিলেন স্বতন্ত্র। একাদশ শতাব্দীতে আরব মনীষী আলবেরুনির মতো সর্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত ভারতবর্ষে বিদেশ থেকে কখনও আসেননি। তাঁর ইতিহাসচর্চা ভারতবর্ষে ইতিহাসচর্চার এক নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। যদিও দশম শতাব্দীর পর থেকেই তুর্ক-আফগান যুগে আরবীয় ইতিহাস রচনার প্রণালী সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। দশম শতাব্দীর পর হতেই আরবি ভাষার পরিবর্তে ইতিহাসচর্চায় পারসিক ভাষা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। এর ফলে ভারতীয় ইতিহাসবিদ্যায় স্থান গ্রহণ করে পারসিক ভাষা ও প্রভাব। তুর্কি বিজয়েই ভারতবর্ষে ইতিহাসচর্চায় পারসিক ইতিহাস প্রণালীর পদ্ধতি প্রয়োগ করার পথ নির্মিত হয়। এর ফলে ইতিহাসশাস্ত্র বিচ্যুত হল আরবীয় ইতিহাসের ধারাবাহিকতার ব্যাখ্যা, তত্ত্ব ও তথ্য, আদর্শ ও প্রেরণা থেকে। মধ্যযুগের ঐতিহাসিকদের রচনায় স্থান পেল মহাপুরুষদের বা গ্রেট ম্যানদের জীবনকেন্দ্রিকতা। রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাবলী অনালোচিত থেকে যায়। তবে এই যুগের ইতিহাসচর্চার সঙ্গে মুঘলদের ইতিহাসচর্চার কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মিল থাকা সত্ত্বেও কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়। তুর্ক-আফগান যুগের ঐতিহাসিকগণ আধুনিক

Scanned with CamScanner

বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টি-সম্পন্ন ঐতিহাসিক ছিলেন না এবং তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত কেবলমাত্র সুলতানের কার্যকলাপের ওপর। তাই তাঁদের ইতিহাসচর্চায় মানুষের সুখ-দুঃখের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় পাওয়া যায় না। এ যুগের গ্রন্থে ব্যাখ্যা ও সমালোচনামূলক পদ্ধতির অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

তবুও এযুগের ইতিহাসচর্চার বহু ত্রুটি সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে ইতিহাস সম্বন্ধে মধ্যযুগের ঐতিহাসিকদের ধারণা ছিল স্পষ্ট। জিয়াউদ্দিন বারনি ইতিহাসচর্চাকে ধর্মগ্রন্থচর্চার ন্যায় পবিত্র বলে অভিহিত করেছেন। বারনির ধারণা ছিল ঐতিহাসিক হবেন ন্যায়নিষ্ঠ, সত্যবাদী ও নির্ভীক। তাই বারনি ইতিহাসচর্চাকে সমাজের উঁচু স্তরের মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল সমাজের নীচুতলার মানুষের কার্যাবলী ইতিহাসের মর্যাদাহানি ঘটায়। আমির খসরু, ইসামি, আফিফ ও ইয়াহিয়া-বিন-আহম্মদ-সিরহিন্দ ইতিহাসকে রাজা-রাজড়াদের কাহিনি বলেই ধারণা করেছেন। তবে আমির খসরু মূলত কবি ও সাহিত্যিক বা শিল্পী, তিনি ঐতিহাসিক হিসাবে কলম ধরেননি। তাঁদের ধারণায় সমাজের নীচুতলার মানুষ ইতিহাসের আলোচনার বিষয় হতে পারে না। আফিফের *তারিখ-ই-ফিরোজশাহী* ও আবু নাসের বিন উতবির লেখা *কিতাব-উল-ইয়ামিনি* শাসক ও ব্যক্তির প্রশস্তিমূলক রচনা। এগুলিকে ইতিহাসচর্চায় মুনাফিক বা ফজাইল শ্রেণীভুক্ত লেখা বলা হয়। তবে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন ইসামি যিনি অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশার ঊর্ধ্বে। জে. এন. সরকার ইঙ্গিত করেছেন যে *ফুতুহ-উস-সালাতিন* যেন ইসামি লিখিত শাহনামা। হার্ডির গ্রন্থ *Historians of Medieval India*-তে এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা স্থান পেয়েছে। ভারতীয় ইতিহাসচর্চার গ্রন্থগুলির মধ্যে তাবাকৎ পদ্ধতির ইতিহাস, আঞ্চলিক ইতিহাস, জীবনীমূলক ইতিহাস এবং সন-তারিখ ভিত্তিক ইতিহাস বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইতিহাস লেখার এই পদ্ধতিগুলি আরবি ইতিহাস শাস্ত্রে বহু পূর্বেই পরিপূর্ণতা পেয়েছিল। *তারিখ-এ-আলফী* সম্বন্ধে রিজভি বলেছেন, গ্রন্থটি লিখিত হয়েছে চূড়ান্ত রকমের ধারাবাহিক রীতিতে। মহম্মদের মৃত্যুর পরবর্তী বছর থেকে শুরু করে প্রত্যেক বছরের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। ঘটনাবিন্যাস রীতি লক্ষ করলেই উপলব্ধি করা যায় তারিখ-এ-আলফীতে আছে আরবি ইতিহাস শাস্ত্রেরই ঘটনা বিন্যাসের একটি বিশেষ রীতির অনুস্মৃতি। আধুনিককালের ইতিহাসের ধারণা অনুসারে প্রতিটি ঘটনার কারণ নিতান্ত মানবীয় এবং ঘটনার সংঘটনে কোনো দৈবিক ও অমানবীয় শক্তির কিছুমাত্র প্রভাব নেই। কিন্তু মুসলমান ঐতিহাসিকগণ গতানুগতিকভাবে মনে করেছেন যে, একমাত্র আল্লাহই সকল ঘটনার সংঘটনকর্তা ও নিয়ন্ত্রণকর্তা। যুক্তিবাদী মোতাজিলা দার্শনিকগণ ধর্মীয় বিচারকেও যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখেছিলেন। আল-আশারি ও তাঁর সমর্থকগণ তর্কশাস্ত্রের সাহায্যেই মোতাজিলা মতবাদ খণ্ডন করে সুন্নি ইসলামকে যুক্তির ভিত্তিতে দৃঢ় করে তুলেছিলেন কিন্তু ভারতে ইতিহাসচর্চায়

Scanned with CamScanner

মোতাজিলা বা আশারীয় চিন্তাভাবনার যুক্তি অনুপস্থিত ছিল। তবে সুন্নি ইসলাম আল্লাহকেই সবকিছুরই পরনিয়ন্তা বলে মনে করে। ইতিহাসের কার্যকারণ ব্যাখ্যায় এই সাধারণ সুন্নি প্রভাবই সক্রিয় ছিল।

তুর্ক-আফগান যুগের ইতিহাসচর্চায় যদিও শাসকদের ইতিহাসই স্থান পেয়েছে এবং দেববিশ্বাস ঘটনার বিশ্লেষণে স্থান পেয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মধ্যযুগের ইতিহাসচর্চায় সাধারণ ইতিহাস রচনায় অত্যন্ত উঁচু স্থান অধিকার করে আছেন মিনহাজউদ্দিন-উস-সিরাজ। তিনি বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উঁচু পদে আসীন ছিলেন। তাঁর লেখা *তাবাকৎ-ই-নাসিরী* ঐতিহাসিক তথ্যের দিক হতে first hand account হিসাবে বিবেচিত। তাঁর গ্রন্থের রচনাকাল ১২৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দ। তিনি শুধু সমসাময়িক ছিলেন না, বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। যদিও গ্রন্থটিতে মুসলমান জগতের সাধারণ ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। তবুও ১২৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লি সুলতানি যুগের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। তাঁর বর্ণিত ঘটনা, সাল-তারিখ ঐতিহাসিকের নিকট যথার্থ বলে বিবেচিত। মিনহাজের ইতিহাসচর্চায় দেখা যায় আধুনিককালের ঐতিহাসিকদের মতো তিনিও মানবতাবাদী ও দৈবনির্ধারণবাদে বিশ্বাস করলেও কখনও কখনও মানুষের ইতিহাসও লিখেছেন। তাঁর বিদগ্ধ পাণ্ডিত্য ইতিহাসের নিয়মবিদ্যাকে নির্ধারিত করেছিল। তিনি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস লেখার প্রণালী হিসাবে বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থ, বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষ্যপ্রমাণ ও জনশ্রুতিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর রচনার বড়ো ত্রুটি হল অত্যন্ত সংক্ষেপে আলোচনা। এর ফলে ইতিহাসচর্চার ব্যবহারিক মূল্য গৌণ হয়ে গেছে। তবে মিনহাজ ইতিহাসকে ঘটনার পরম্পরা হিসাবে দেখেছেন।

এখন প্রশ্ন মধ্যযুগের ইতিহাসচর্চার প্রকৃতি কেমন ছিল বা তাঁদের ইতিহাসের বিষয়বস্তু কী হবে, সে সম্পর্কে তাঁদের ধারণাই বা কী ছিল তা জানা প্রয়োজন। যদিও ইতিহাস কীভাবে লেখা হবে সে নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁরা একমত ছিলেন যে ইতিহাস হওয়া উচিত record of events। যদিও মানুষের বলা ও করাকে একেবারে বাদ দিয়ে নয়। ইতিহাস লেখায় তিনটি নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রথম নীতি হল স্থান ও কালকে কেন্দ্র করে বিশ্ব ইতিহাস ও বিশেষ কোনো ইতিহাসের পার্থক্য নির্ধারণ করা। দ্বিতীয় নীতি হল শাসকদের ঘটনায় অংশগ্রহণের জীবনবৃত্তান্ত। তৃতীয় নীতি হল প্রাথমিক পর্বের ইসলামের ইতিহাসের ঘটনাবলী বিচার করা হয়েছে। আরবীয় ইতিহাসচর্চার বিবর্তনের প্রথম দিকে বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল ইসলামের ইতিহাস বিশেষ করে মহম্মদের জীবন ও দর্শনকে কেন্দ্র করে। তারপর তাঁরা বিশ্ব ইতিহাসের দিকে অগ্রসর হন। আরবীয় ইতিহাসচর্চায় জীবনী ও ঐতিহাসিক নথিপত্র উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল কিন্তু ঐতিহাসিক সাহিত্যের স্থান ছিল না। বিভিন্ন ধারায় ইতিহাস লেখা

Scanned with CamScanner

হয়। আমরা আরবীয় ইতিহাসচর্চায় বিভিন্ন রকমের প্রণালী ও ক্ষেত্র দেখতে পাই। আরবীয় ইতিহাসচর্চায় ছয়টি ধারা দেখা যায়—(১) ট্র্যাডিশন, (২) মনোগ্রাফ জাতীয়, (৩) ক্রনোলজিক্যাল, (৪) টপোগ্রাফিক্যাল জাতীয়, (৫) টপোগ্রাফিক্যাল বা স্থানীয় ইতিহাস এবং (৬) বিজ্ঞানভিত্তিক ইতিহাস রচনা।

উপরোক্ত আরবীয় ইতিহাসচর্চার ছয়টি ধারাকে বিশ্লেষণে দেখা যায়—

১. ট্র্যাডিশনাল জাতীয় ইতিহাস ঃ লেখা শুরু হয় উমাইদ বংশীয় খলিফাদের সময় (৬৬১-৭৫০ খ্রিস্টাব্দ) হাদিস-কে অবলম্বন করে।

২. মনোগ্রাফ জাতীয় লেখা ঃ এটা একটা আদর্শস্থানীয় ইতিহাস লেখার প্রণালী যা নবম শতাব্দীর শেষে (৭৫০-৮৯২ খ্রিস্টপূর্ব) শুরু হয়েছিল। ইবন ইজাক ও অল্-ওয়াকিদির লেখা হজরত মহম্মদের জীবনী ও অল্-বিলাধুরির যুদ্ধ জয়ের ইতিহাস এই মনোগ্রাফ প্রণালীর ইতিহাসচর্চার দৃষ্টান্ত।

৩. ক্রনোলজিক্যাল জাতীয় ঃ নবম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত দু'শো বছর আরবীয় ইতিহাসচর্চা ধর্মীয় ট্র্যাডিশনের ওপর ভিত্তি করে একই ধরনের ইতিহাসচর্চা হয়েছিল কিন্তু তব্‌রি (১০০০ খ্রিস্টাব্দ) ইতিহাসচর্চার এক নতুন প্রণালীর সূত্রপাত করলেন তা হল ক্রনোলজিক্যাল জাতীয় লেখা। হিট্টি (Hitti) বলেছেন "the idea of chronological collection of events developed into a plan of complete series of annals." ইতিহাসচর্চার এই বিশ্লেষণমূলক প্রণালী তব্‌রির পর অনেকেই গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন মিসকাওয়াহি (Miskawaihi, 1030 A.D.)।

৪. টপোগ্রাফিক্যাল জাতীয় লেখা ঃ টপোগ্রাফিক্যাল প্রণালীতে সর্ববিদ্যা বিশারদ মাসুদি (৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ) ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে একটা প্রণালী সংযোজন করেন। এই প্রণালীতে রাজা ও রাজবংশকে কেন্দ্র করে আবর্তিত ঘটনাগুলিকে সংঘবদ্ধ করে ঘটনাবলীর বিন্যাসের সূচনা হয়। এই রীতি ইবন খালাদুন ও অন্যান্য ইতিহাসবিদ অনুসরণ করেন কিন্তু তব্‌রির সমীক্ষামূলক লেখার মতো আনুকূল্য অর্জন করতে পারেননি।

৫. টপোগ্রাফিক্যাল বা স্থানীয় ইতিহাস লেখার প্রণালী ঃ ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে স্থানীয় বিবরণ ও স্থানীয় ইতিহাস রচনার ওপর জোর দেন অল্-ম্যাকরিজি (১৩৬৪-১৪৪২ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি ট্র্যাডিশনাল ইতিহাস লেখার প্রণালীকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেননি।

৬. বিজ্ঞানভিত্তিক লেখা ঃ আরবীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক ইতিহাসচর্চার প্রথম সূচনা করেন টিউনিসবাসী ইবন খালাদুন (১৩৩২-১৪০৬ খ্রিস্টাব্দ)। খালাদুন সম্পর্কে ফ্লিন্ট বলেছেন, "As regards the science or philosophy of history, Arabic literature was adorned by one most brilliant name.

Scanned with CamScanner

Neither the classical nor the medieval Christian world can show one of nearly the same brightness." তিনি ছিলেন একাধারে ঐতিহাসিক, রাজনীতিক, তাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, অর্থনীতিক, দার্শনিক এবং মনুষ্য সম্বন্ধীয় জ্ঞানপিপাসু। দীপ্ত প্রতিভায় তিনি ছিলেন ভাস্বর। তিনিই প্রথম জোর দিয়েছিলেন ইতিহাস হবে মানুষের সামাজিক জীবনের এক প্রতিচ্ছবি। সমাজতত্ত্ববিদরা তাঁকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের বিশদ ব্যাখ্যাকার হিসাবে শ্রদ্ধা করেন। আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা তাঁকে অ্যারিস্টটলের আসনে বসিয়েছেন। তাঁর *Muqaddamah*-তে লিখেছেন "History is the record of society or world civilisation of the changes that take place in the nature of that society, such as savagery, sociability and group solidarity..." অধ্যাপক খুদা বক্সের মতে ইবন খালাদুনের লেখা ইতিহাস "almost in modern style and on modern principles"। খালাদুন সম্পর্কে Sarton মন্তব্য করেছেন "Not only is he the greatest historian of the Middle Ages, towering like a giant over a tribe of pygmies but one of the first philosophers of history, a forerunner of Machiavelli, Bodin, Vico, Comte and Curnot"। আর Arnold J. Toynbee বলেছেন "He has conceived and formulated a philosophy of history which is undoubtedly the greatest work of its kind that has ever yet been created by any mind in any time or place." স্বভাবতই আরবীয় ইতিহাসচর্চায় সব দিক দিয়ে খালাদুন বিদ্বৎইতিহাসে সমুচ্চ স্থান অধিকার করে আছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসচর্চায় আরবীয় ইতিহাসচর্চার অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল এবং আরবীয় ইতিহাসচর্চার ধারণা ভারতবর্ষে মধ্যযুগের ইতিহাসচর্চাকে ও ধর্মীয় ইতিহাসকে যুক্তি, তথ্য ও ব্যাখ্যার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে।

কারণ মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসচর্চার আদিপর্ব সৃষ্ট রাজপুতনার বার্দিক সাহিত্য, ব্যালাড, বীর রসের কবিতা এবং রাস (Rasas) যা কর্নেল টড্ বিশ্বাস করেছিলেন এবং মধ্যযুগের রাজপুতনার খায়াত, অহোম ও অসমীয় বুরুঞ্জি (১২২৬-১৮২৬), মারাঠা বাখার (Maratha Bakhars), শিখ উপাদান এবং সাখি গ্রন্থ (Sakhi Books) কোনোটাকেই প্রকৃত অর্থে ইতিহাসচর্চা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। যদিও এগুলিতে ইতিহাসচর্চার উদ্দেশ্যের অনেক সাক্ষ্য পাওয়া যায় কিন্তু এগুলির বিষয়বস্তু খুবই দুর্বল এবং সাল-তারিখ নিরূপণে বিদ্যার অভাব পরিলক্ষিত হয়। রাজপুত ব্যালাড, মারাঠা বাখার ও অসমীয় বুরুঞ্জি লেখকদের মধ্যে Science of historical criticism প্রায় সম্পূর্ণ অজানা ছিল। তাঁরা রাজার পৃষ্ঠপোষকতা ও জনগণকে আনন্দ দেওয়ার জন্য যা শুনেছেন ও বিশ্বাস করেছেন তাই সত্য ভেবেছেন। এই সীমাবদ্ধতাগুলিই রাজনৈতিক ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া,

Scanned with CamScanner

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের আধুনিক ধারণা আদিমধ্য যুগের ভারতীয় ইতিবৃত্তকারদের অজানা ছিল।

আবার এই ভারতীয় ঐতিহাসিক সাহিত্য ও আধা-ঐতিহাসিক সাহিত্যের বিভিন্ন দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূল্য আছে। প্রথমত, সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐতিহাসিকদের জন্য তাঁরা সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ data রেখে গেছেন এবং দ্বিতীয়ত, "they serve as a check on and sometimes as a supplement to Muslim Chronicles and give incidental references on social aspects of the age."

আদিমধ্য যুগের ইতিহাসের উপাদান

উনিশ শতকে ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে যে বৈজ্ঞানিক বিচার বিশ্লেষণ, বৌদ্ধিক অনুসন্ধিৎসার সূচনা হয় তার ফলেই আধুনিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে 'তত্ত্ব' ও 'নিয়মবিদ্যা'-এর আবির্ভাব ঘটে। তবে আদিমধ্য যুগের ভারতের ইতিহাসচর্চার অনেক উপকরণ ও তথ্য থাকা সত্ত্বেও 'বিদ্যা' এবং 'নিয়মের' অভাবে বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক গ্রন্থের সম্পূর্ণ অভাব দেখা যায়। কর্নেল টড্, আরবীয় পণ্ডিত আলবেরুনি, ফ্লিট প্রমুখ বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ ভারতীয় ইতিহাসচর্চার এই দৈন্যতার কথা উল্লেখ করেছেন। আবার আদিমধ্য যুগে যথার্থ ঘটনার ও জনশ্রুতির মধ্যে পার্থক্য-জ্ঞানের অভাব থাকায় ভারতীয়গণ বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস লেখার প্রণালী সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। এটা যথার্থ যে হেরোডোটাস বা থুকিডিডিসের মতো ঐতিহাসিক এযুগে ভারতে জন্মগ্রহণ করেননি বা তাদের মতো ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে তেমন কেউই অবদান বা দৃষ্টান্ত রাখতে সমর্থ হননি। কিন্তু এযুগে ভারতীয়রা একেবারে ইতিহাসচর্চা করেননি তা বলা যায় না। তবে প্রাচ্যবাদীরা যে ইতিহাসচর্চা আমাদের মনে জাগ্রত করেছিল তার ফলে ভারতীয় পণ্ডিতগণ ধ্যানধারণা ও চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে পাশ্চাত্য রীতিনীতি, তত্ত্ব ও তথ্য, পদ্ধতি ও কলাকৌশল আয়ত্ত করে সেগুলিকে ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থ, ঐতিহাসিক তথ্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলিকে নিবিড়ভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ, পরীক্ষা ও তার ব্যাখ্যা প্রয়োগ করতে শিখিয়েছিল। তার দ্বারা ব্রিটিশ প্রাচ্যবাদের অংশ হিসাবে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য ও অনুসন্ধানের ফলে এযুগে ভারতবর্ষে ইতিহাসচর্চা সম্পর্কে এমন সব অসংখ্য তথ্য ও প্রমাণ পাওয়া গেছে যা ইতিপূর্বে কখনো সম্ভব হয়নি। অসংখ্য মৌলিক ঐতিহাসিক সাক্ষ্য বা উপাদানের সাহায্যে আদিমধ্য যুগের ভারতের ইতিহাস নতুনভাবে লেখা হয়েছে।

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর বিখ্যাত *Historiography of Modern India* গ্রন্থে বলেছেন যে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের প্রভাবে ইওরোপের আদর্শের রীতিনীতি

Scanned with CamScanner

পদ্ধতির দ্বারা প্রাচীন ও আদিমধ্য যুগের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন পদ্ধতির পথ নির্মিত হয়। ইওরোপীয় লেখকদের কাছ থেকে ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ কলাকৌশল-ধারণা, নিয়মবিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন এবং পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। আবার কিছু ইংরেজ ঐতিহাসিক ভারত ইতিহাস সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করায় ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের বিকাশ, ইতিহাস চেতনাকে নতুন পদ্ধতির পথে অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ করে। ভারতে ইতিহাসচর্চার আবির্ভাব মূলত আধুনিককালে ঘটলেও আদিমধ্য যুগে ইতিহাসচর্চা যে একেবারে ছিল না তা একেবারে বলা যায় না। যদিও আদিমধ্য যুগে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্র হিসাবে প্রথমেই দুটি গ্রন্থকে উল্লেখ করতে হয়—(ক) বাণভট্টের *হর্ষচরিত* এবং (খ) কলহণের *রাজতরঙ্গিণী*। বাণভট্টের হর্ষচরিতকে ইতিহাসচর্চার উপাদান হিসাবে তেমন স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। কারণ বাণভট্ট হর্ষবর্ধনের চরম গুণগ্রাহী হওয়ায় তাঁর গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক দিকটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি নিরপেক্ষতা লঙ্ঘন করেছেন। তাই অনেকে মনে করেন বাণভট্টের *হর্ষচরিত* ইতিহাসের মতো হলেও যথার্থ অর্থে ইতিহাস নয়। ড. মজুমদারও মন্তব্য করেছেন 'হর্ষচরিত' ইতিহাসচর্চার যোগ্যতা দাবি করতে পারে না। তবে জীবনী গ্রন্থগুলির মধ্যে *হর্ষচরিত* নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক তথ্যে সমৃদ্ধ। তবে *হর্ষচরিত* গ্রন্থের অনেকটা জুড়েই তিনি নিজের জীবন সম্পর্কে অনেক কথাই বলেছেন। তা থেকে জানা যায়, কান্যকুব্জ বা বর্তমান উত্তরপ্রদেশের কনৌজের শোন নদীর তীরে প্রীতিকূট নামক গ্রাম ছিল তাঁর বাসস্থান। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান। তাঁর পিতার নাম ছিল চিত্রভানু ও মাতার নাম রাজ্যদেবী। শৈশবে পিতৃ ও মাতৃ বিয়োগ ঘটায় অভিভাবকহীন অবস্থায় তাঁর প্রথম যৌবনে নৈতিক পদস্খলন ঘটে এবং নানা ধরনের ও বিচিত্র পেশার সঙ্গীদের সঙ্গে বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। এরফলে নিঃসন্দেহে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার আলোকে আলোকিত হন এবং বিচিত্র মহার্ঘ্যে তাঁর মধ্যে কলাজ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও জীবন জিজ্ঞাসার প্রেরণা জোগায়।

দীর্ঘকাল দেশ পরিভ্রমণের পর তিনি নিজের গ্রামে ফিরে আসেন এবং অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করেন। পরবর্তীকালে হর্ষবর্ধনের সভাপণ্ডিতদের সঙ্গে শাস্ত্রবিচারে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়ে বাণভট্ট কনৌজ রাজসভার প্রধান পণ্ডিতের পদে ব্রতী হন এবং হর্ষবর্ধনের অত্যন্ত প্রিয়পাত্রে পরিণত হন। হর্ষবর্ধনের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি *কাদম্বরী* নামে একটি আখ্যায়িকা ও *হর্ষচরিত* নামে তাঁর রাজ-পৃষ্ঠপোষকের একটি জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু তিনি কোনো গ্রন্থই সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। কেন তিনি সমাপ্ত করতে পারেননি সে সম্পর্কে নানা অভিমত আছে।

হর্ষচরিত গ্রন্থটি প্রধানত গদ্যে ও সামান্য পদ্যে লিখিত। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু অলঙ্কারবহুল সংস্কৃত ভাষায় রচিত। গ্রন্থটি আটটি উচ্ছ্বাস বা বিভাগে বিভক্ত। মুদ্রিত আকারে গ্রন্থটি ২৫০ পৃষ্ঠারও বেশি আয়তনের গ্রন্থ। কিন্তু বাণভট্ট তাঁর গ্রন্থে হর্ষবর্ধনের

Scanned with CamScanner

রাজত্বকালের প্রথম কয়েক মাসের ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। অবশ্য ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন যে, ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে এমন সব ঘটনা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে তা বারো পৃষ্ঠার মতো হবে কিনা সন্দেহ। আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে তাঁর মতে *হর্ষচরিত* ইতিহাসের মতো হলেও প্রকৃত অর্থে ইতিহাস নয়। তিনি ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উপর সেরূপ গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টি দেননি। অবশ্য আরো অনেক ঐতিহাসিক গ্রন্থ যে নেই তা নয়। তবে আদিমধ্য যুগের সংস্কৃত ভাষায় লেখা কলহণের *রাজতরঙ্গিণী*-তে সর্বপ্রথম কলহণ যে আধুনিক মন নিয়ে ইতিহাসচর্চা করেছেন তা স্পষ্ট। প্রথমত, কলহণের 'নিয়মবিদ্যা' অজানা ছিল তা বলা যায় না। এমনকি আধুনিক ইতিহাসচর্চার ধ্যানধারণা ও পদ্ধতি *রাজতরঙ্গিণীতে* গ্রহণ করা হয়েছিল। ঐতিহাসিক কেমন হবেন তারও ইঙ্গিত কলহণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন একজন ঐতিহাসিককে বিচারকের আসনে বসতে হবে এবং তাঁকে সবকিছু মুক্তমন দিয়ে বিচার করতে হবে। এমনকি কলহণের সমালোচনামূলক মানসিকতাও ছিল। তিনি তাঁর পূর্বসূরি ক্ষেমেন্দ্রের রচনা বিচার বিবেচনা করে তবেই গ্রহণ করেছেন। তিনি লিপির উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এইদিক বিচার করলে বলা যায় দ্বাদশ শতাব্দীতে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে কলহণ বিস্ময়কর চিন্তার সাক্ষ্য রেখে গেছেন। *রাজতরঙ্গিণী* যথার্থ অর্থে প্রথম একটি আধুনিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক গ্রন্থের মর্যাদা দাবি করতে পারে। আধুনিক ইতিহাসচর্চার মানদণ্ডে *রাজতরঙ্গিণী* উত্তীর্ণ বলা যেতে পারে।

গ্রন্থটির রচনাকাল ১১৪৮-৪৯ খ্রিস্টাব্দ। প্রাচীন ভারতে রচিত গ্রন্থসমূহের চেয়ে এই গ্রন্থটি সবচেয়ে ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসাবে এগিয়ে আছে। ঐতিহাসিক এ. এল. ব্যাসাম তাই বলেছেন, "The book is unique as the only attempt at the true history in the whole of surviving Sanskrit literature"। *রাজতরঙ্গিণী* আধুনিক মানদণ্ডের বিচারে যথাযথ অর্থে একটি ইতিহাস গ্রন্থ।

রাজতরঙ্গিণী আটটি বিভাগে বিভক্ত ও প্রায় আট হাজার শ্লোকে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। শ্লোকগুলি অত্যন্ত উচ্চমানের। *রাজতরঙ্গিণীর* রচনাশৈলী অপেক্ষাকৃত সরল। তবে কলহণ কোনো কোনো স্থানে অলঙ্কারবহুল ভাষা যে ব্যবহার করেননি তা নয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তিনি ইতিহাসকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তার শেষ দুটি অধ্যায়ে বিষয়বস্তুর বর্ণনা করেছেন অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ শব্দ ব্যবহারে। তবে কলহণ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাশ্মীরের প্রত্যেক রাজার সিংহাসন আরোহণের তারিখ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রত্যেক রাজার রাজত্বকালে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির তারিখ কদাচিৎ উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিক ব্যাসামের মতে, "It seems clear that his chronicle was written primarily for readers who already knew the main course of recent history"।

Scanned with CamScanner

কলহণ এই গ্রন্থে আঞ্চলিক এক দেশপ্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে কলম ধরেছিলেন এবং কাশ্মীরকে কোনো আক্রমণকারী কোনোদিন জয় করতে পারেনি একথা বলে কাশ্মীরের প্রতি তাঁর ভালোবাসার এক চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। কাশ্মীরের মনোরম নদী, শীতল জল, আপেল ও দ্রাক্ষা ইত্যাদির জন্য তিনি তাঁর জন্মভূমিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থান বলে অভিহিত করেছেন। কলহণের কাশ্মীর শুধুমাত্র একটি পাহাড়ি দেশ ছিল না ; বাইরের জগতেও তাঁর কাশ্মীরের যথেষ্ট রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। সুশাসন সম্পর্কে কলহণের সুস্পষ্ট অভিমত ছিল। তিনি পরম্পরাগত রাজনীতির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনিই একথাই বলেছেন যে, একজন শক্তিশালী রাজাই শুধু তাঁর অধীনস্থদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে ও জনগণের প্রতি প্রজানুরঞ্জনের আদর্শ অনুসরণ করতে সক্ষম। তিনি আমলাতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে আমলাতন্ত্রকে শক্তিশালী হতে দেওয়া উচিত নয়। তিনি বলেছেন কাঁকড়াবিছা যেমন পিতাকে ও উইপোকা যেমন মাতাকে ধ্বংস করে ঠিক তেমনি অকৃতজ্ঞ কায়স্থ বা আমলা শক্তিশালী হয়ে উঠলে সব কিছুই ধ্বংস করে। তিনি দমন-পীড়নেরও নিন্দা করেছেন। *রাজতরঙ্গিণী* হল অংশত একটি রাজনৈতিক প্রচারমূলক গ্রন্থ। এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য ছিল দেশে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য শাসক শ্রেণীকে প্রণোদিত করা।

কলহণ ঐতিহাসিক নিরপেক্ষতা স্বীকার করেছেন। তাঁর সময়কার রাজাদের সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত মোটামুটি সঠিক বলে ব্যাসাম অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কলহণ ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ। স্বভাবতই তাঁর ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল রক্ষণশীল। কলহণের ইতিহাসচিন্তা কর্মতত্ত্বের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। নিজেদের ইতিহাসকে কিছু পরিমাণে রূপায়িত করতে মানুষ একেবারেই অক্ষম এমন কথা কলহণ কোথাও স্পষ্টভাবে বলেননি। ইতিহাসে কলহণ অদৃষ্টের ভূমিকাকেও অস্বীকার করেছেন। কলহণ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, প্রতিকূল ভাগ্যকেও জয় করা যায়।

আদিমধ্য যুগের ইতিহাসের উপাদানগুলিকে তিনভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে—(ক) সাহিত্য, (খ) লেখ, (গ) মুদ্রা। এযুগের সাহিত্যই সবথেকে বড়ো উপাদান। তবে যে দুটি ব্যতিক্রমী এযুগের সাহিত্যগ্রন্থ তা উপরে প্রথমেই আলোচনা করার প্রয়াসী হয়েছি। এযুগে বাণভট্ট ও কলহণ ছাড়াও আরো অনেকে সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁর মধ্যে বিলহণ *বিক্রমাঙ্কদেবচরিত* নামে একটি গ্রন্থ লিখেছেন। অনেকে মনে করেন এ গ্রন্থটি চালুক্য বংশীয় রাজা ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের জীবনী। এই গ্রন্থেও ইতিহাসের ধারা লঙ্ঘিত হয়েছে। এটিকে ঠিক ইতিহাসগ্রন্থ বলা যায় না। বাক্‌পতিরাজ *গৌড়বহো* নামে একটি কল্পনামিশ্রিত ঐতিহাসিক কাব্য লিখেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই কাব্যে কনৌজরাজ যশোবর্মন কীভাবে গৌড়রাজকে বধ করেছেন তা কল্পিত হয়েছে। রামপালের সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দীর লেখা *রামচরিত* একটি উন্নতমানের কাব্য। যদিও এই গ্রন্থে রামপালের পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাঁর সময়ে মহীপালের পতন

Scanned with CamScanner

ও দিব্যের অভ্যুত্থান সম্পর্কে একমাত্র ঐতিহাসিক উপাদান হল সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত কাব্য। কিন্তু এই কাব্য দ্ব্যর্থবোধকভাবে রচিত। তাঁর সময়ে যে কৈবর্ত বিদ্রোহ ঘটেছিল তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যে সমৃদ্ধ নয়। আবার এক অর্থে রামচন্দ্রের বিজয়ের গুণকীর্তন করা হয়েছে, অন্য অর্থে পালরাজা রামপালের জীবন ও সিংহাসন লাভ ও তাঁর কৃতিত্বের বর্ণনা আছে। ঐতিহাসিকরা দ্বিতীয় অর্থকে ঐতিহাসিক উপাদান বলে ব্যবহার করেন। অনেকে মনে করেন সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত* পালবংশের প্রতি পক্ষপাতদোষে দুষ্ট। কারণ তিনি সভাকবি হিসাবে নির্ভীকভাবে সত্যভাষণ লিপিবদ্ধ করবেন এমন আশা করা যায় না। তাই ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর *Ancient India* গ্রন্থে বলেছেন যদি বাণভট্টের হর্ষচরিতকে হর্ষের প্রতি ঈষৎ পক্ষপাতদুষ্ট এবং শশাঙ্কের প্রতি বিরোধী ভাবাপন্ন বলা হয় তাহলে সন্ধ্যাকরের রচনা একই দোষে দুষ্ট। তাই তিনি বলেছেন সন্ধ্যাকর নন্দীর দেওয়া তথ্যকে সাবধানতার সঙ্গে অবলম্বন ও অনুধাবন করতে হবে। এইসময় আরো কয়েকটি সাহিত্য গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জয়সিংহের লেখা *কুমারপালচরিত*, পদ্মগুপ্তের লেখা *নবশশাঙ্কচরিত*। এগুলি জীবনীগ্রন্থ। রাজার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে লিখেছিলেন। ন্যায়চন্দ্রের *হামিরকাব্য*, হেমচন্দ্রের *কুমারপালচরিত* ও *ভবভাবনা* (১১২৩ খ্রিস্টাব্দ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। চাঁদবরদাই-এর *পৃথ্বিচরিত* এই পর্যায়ে পড়ে। যথার্থ অর্থে এগুলিকে কোনোমতেই ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলা যায় না। এগুলি ইতিহাসে সাহিত্য হিসাবেই স্থান পেয়ে থাকে। তাছাড়া আছে সোমেশ্বরের *রাসমালা*, বালচন্দ্রের *বসন্তবিলাস*। এগুলি থেকে কাশ্মীরের মতো গুজরাটের ইতিহাস পাওয়া যায়। এগুলিতে ইতিহাস, সাহিত্য ও জনশ্রুতি একাকার হয়ে গেছে। তাই এগুলিকে ইতিহাসের যথার্থ উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। খুব সাবধানতার সঙ্গে এগুলি গ্রহণ করা উচিত।

প্রাচীন ভারতে 'ঘটনাপঞ্জি' রচনার যথেষ্ট প্রবণতা ছিল। এইরকম ঘটনাপঞ্জি থেকেই কলহণ ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। এগুলি হল 'নেপালি বংশতালিকা', পুরাণে উল্লিখিত বংশতালিকার অনুরূপ। সিন্ধুদেশেও অনুরূপ ঘটনাপঞ্জির উপর ভিত্তি করেই আরবি ঐতিহাসিক *চাচনামা* লিখেছিলেন। আসামের 'বুরুঞ্জি' এই ধরনের ঘটনাপঞ্জি। প্রাচীন ভারতে এই ঘটনাপঞ্জি লেখার একটি পদ্ধতি ছিল। ইতিহাসের সমগোত্রীয় আরেক ধরনের গ্রন্থ প্রাচীন ভারতে রচিত হয়েছিল। এগুলি প্রবন্ধ বা Narratives নামে পরিচিত। এইরকমই একটি গ্রন্থ মেরুতুঙ্গ রচিত *প্রবন্ধ চিন্তামণি* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাই বলা যায় প্রাচীন ভারত ও আদিমধ্য যুগের ভারতবর্ষে ইতিহাসচর্চা ছিল কিন্তু আধুনিক ইতিহাসচর্চার নিয়ম ও প্রণালী জানা ছিল না।

আদিমধ্য যুগের ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে পুরাণকে ব্যাখ্যা করলেও এর মূল্য নেই বলেই মন্তব্য করেছেন ড. পারজিটার। কারণ পুরাণে যেসমস্ত সাল তারিখ

Scanned with CamScanner

উল্লেখ করা হয়েছে তা বিতর্কিত। তাই পুরাণের তথ্য সাহিত্যিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক নির্ভরযোগ্য উপাদানের সমর্থন ছাড়া এগুলি গ্রহণ করা ঐতিহাসিক দিক থেকে যুক্তিযুক্ত হবে না। আবার পুরাণগুলি ঠিক কোন্ সময় রচিত হয়েছিল সেগুলি নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। তবে ১৮টি পুরাণের মধ্যে যেগুলি ইতিহাসের উপাদান হিসাবে গ্রহণ করি সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বিষ্ণুপুরাণ', 'বায়ুপুরাণ', 'মৎস্যপুরাণ', 'ভবিষ্যপুরাণ'। সম্ভবত এগুলি চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়েছিল। এদিক থেকে বিচার করলে আদিমধ্য যুগের ইতিহাসে পুরাণ গ্রহণযোগ্য উপাদান নয়। কিন্তু পুরাণগুলিতে যেসকল নদী, পর্বত, শহর ও নগরের উল্লেখ আছে সেগুলি আমাদের আলোচ্য সময়ের ভৌগোলিক তথ্য জানতে সাহায্য করে। এদিক থেকে বিচার করলে দাক্ষিণাত্যের তামিল সাহিত্য যা ইতিহাসে 'সঙ্গম সাহিত্য' নামে পরিচিত তা থেকেও খ্রিস্ট জন্মের পর কয়েকশো শাসকদের পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবত খ্রিস্টীয় প্রথম তিন-চারশো বছর ধরে তামিল দেশে যে সাহিত্য রচিত হয় তাকেই আমরা সঙ্গম সাহিত্য বলে অভিহিত করি। চম্পকলক্ষ্মীর মতে পুরাতন প্রস্তর যুগের মানুষজন ও তাদের কৃষি ও কৃষকের পরিচয় পাওয়া যায়। এযুগের মানুষ লোহার ব্যবহার শিখেছিল। সাহিত্য সংকলনগুলিতে ২২৭৯টি কবিতা আছে। এগুলি ৪৭৩ জন কবি রচনা করেন। এদের মধ্যে মহিলা কবিরাও ছিলেন। সঙ্গম যুগে দু'খানি মহাকাব্য রচিত হয়—*শিলপ্পাদিকরম* ও *মণিমেকলাই*। শিলপ্পাদিকরম লেখেন—ইলান কোভাতেকল। মণিমেকলাই নামক মহাকাব্যটি লেখেন মাদুরাই-এর সাত্তানার। তিনি ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। শিলপ্পাদিকরমে জৈন ধর্মের প্রতি আকর্ষণ লক্ষ করা যায়। আর মণিমেকলাই মহাকাব্যে বৌদ্ধধর্মের প্রশংসা লক্ষ করা যায়। সঙ্গম সাহিত্যের রচনাকালও আনুমানিক ৩০০-৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। তামিলনাড়ুর মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষির বিবরণ ও জমি এবং কৃষিতে সেচের বিবরণ সঙ্গম সাহিত্যে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে সঙ্গম সাহিত্যে খ্রিস্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে তামিল দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের চিত্র পাওয়া যায়। সঙ্গম সাহিত্য থেকে জানা যায় এ যুগের মানুষ লিখতে শিখেছিল, শহর ছিল, বিশেষ ধরনের কারিগরি শিক্ষা ছিল এবং দূরপাল্লার বাণিজ্য ছিল।

আদিমধ্য যুগের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল যে সমস্ত বিদেশি ভারতবর্ষে এইসময় এসেছিলেন তাদের লিখিত বিবরণ এই যুগের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এযুগে চীনা ও আরবীয়দের আগমন ঘটেছিল এবং তাদের লিখিত বিবরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চীনা পর্যটক ইৎ সিং (৬৭১-৯৫) তাঁর ভারত ভ্রমণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর গ্রন্থের নাম *কাউ-ফা-কান-স্যাং-চুয়েন*। ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে এ যুগের কিছু তথ্য তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায়। এরপর হিউয়েন সাঙের

Scanned with CamScanner

বিবরণ এই যুগে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। তাঁর বিবরণেও ভৌগোলিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। দীর্ঘদিন ধরে (৬৩৯-৪৪) তিনি ভারতে অবস্থান করেন এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যেভাবে পরিভ্রমণ করেছিলেন তা *সি-ইউ-কি* নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর বিবরণে তৎকালীন যুগের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও বিভিন্ন রাজ্যের অবস্থা এবং হর্ষবর্ধনের ব্যক্তিগত সুহৃদ হওয়ায় তাঁর জীবন ও তাঁর রাজ্যগুলির অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করেন। হর্ষবর্ধনের প্রতি অবশ্য তিনি পক্ষপাত দেখিয়েছেন বলে ড. মজুমদার হিউয়েন সাঙের বিবরণকে সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণ করতে বলেছেন। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথ হর্ষবর্ধন, শশাঙ্ক ও পালরাজাদের সম্পর্কে বহু তথ্য দিয়েছেন। তবে এইসব বিদেশিরা বৌদ্ধ বিষয় সম্পর্কেই বেশি আগ্রহী ছিলেন। তাছাড়া তারানাথের লেখা পরবর্তীকালে লেখা হয়েছিল বলে তেমন মূল্য দেওয়া হয় না। রাজনৈতিক ঘটনার প্রতি তাঁদের খুব একটা মনোযোগ ছিল না। এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাঁদের বিবরণী ভারত ইতিহাসের অমূল্য তথ্য সরবরাহ করে।

তবে ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ-বিন-কাশিমের নেতৃত্বে আরবদের সিন্ধুবিজয় আদিমধ্য যুগের ইতিহাসচর্চায় এক নতুন যুগের সূত্রপাত ঘটায়। কারণ আরবদের সিন্ধুবিজয় আদিমধ্য যুগের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর ফলে বহু আরবীয় পণ্ডিত ভারতবর্ষ সম্পর্কে আকৃষ্ট হন এবং অনেক আরবীয় পণ্ডিতের ভারতবর্ষে আগমন ঘটে। তাদের লিখিত বিবরণ এযুগে এক অমূল্য ঐতিহাসিক দলিল। *চাচনামা* এরকমই একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ যা থেকে আমরা আরবদের সিন্ধু অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাই। *চাচনামা* সিন্ধু অভিযানের তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে এ যুগের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই গ্রন্থটিতে রাজা দাহিরের পিতা চাচের সিংহাসনলাভ এবং আরবদের সিন্ধুবিজয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাছাড়া, এই গ্রন্থে চাচনামা বলে কোনো শব্দ লিখিত হয়নি বরং এর ভূমিকায় ফাতাহনামা বা বিজয়গাথা নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই গ্রন্থে মহম্মদ-বিন-কাশিমের সিন্ধু অভিযানের প্রাক্কালে সিন্ধুদেশের বিস্তৃত বিবরণ আছে। তখনকার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি এতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। নাসিরউদ্দিন কুবাচার রাজত্বকালে ১২১৬ খ্রিস্টাব্দে পারসিক ভাষায় এই গ্রন্থ অনুবাদ করেন আবু বকর কুফি। তবে *চাচনামা* গ্রন্থটি মূল আরবি ভাষায় লেখা। কে এবং কখন লিখেছেন তার সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থে মানসুরা নগরের উল্লেখ না থাকায় এই গ্রন্থের রচনা আব্বাসীয় খলিফা আল মনসুরের সিংহাসন আরোহণের (৭৫৪ খ্রিস্টাব্দ) পূর্বেই লেখা হয়েছিল। কারণ খলিফা আল মনসুর সিংহাসনে আরোহণ করে তার নামানুসারে সিন্ধুর প্রধান নগর আল মানসুরার গোড়াপত্তন করেছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে তা হলে আরবি ভাষায় লিখিত *চাচনামা* গ্রন্থটির রচনাকাল ৭১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭৫৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নির্দিষ্ট করা হয়। এই গ্রন্থের কোথাও তার

Scanned with CamScanner

রচনাকাল উল্লেখ নেই। ভারতবর্ষে আরবীয় রাজত্বকালের প্রাথমিক পর্বের আঞ্চলিক ইতিহাসের প্রথম জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত চাচনামা গ্রন্থটি। এই গ্রন্থটিই ঐতিহাসিক তথ্যের দিক থেকে একমাত্র 'First rate authority' বলে স্বীকার করা হয়। পরবর্তী ঐতিহাসিক নিজামউদ্দিন আহমদ, নুরুল হক, ফিরিস্তা, মির মাসুম এই গ্রন্থকে অনুসরণ করেন। এলফিন্সটোন এই গ্রন্থকে দেখেছিলেন "a minute and consistent account of the transactions during Muhammad Kasim's invasion and some of the preceeding Hindu reigns. It is full of names and places."

সিন্ধুর আঞ্চলিক ইতিহাস অবগত হওয়ার জন্য *চাচনামা* একটি মূল্যবান গ্রন্থ। রাজা দাহিরের পিতা চাচ আলোরকে রাজধানী করে সিন্ধুতে চাচবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। চাচের পুত্র দাহির ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর রাজা দাহিরের ক্ষমতা ও রাজ্যের বিস্তৃতকরণের ইতিহাস এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ঘটনার ধারাবাহিকতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষুণ্ণ হলেও সিন্ধু এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও পটপরিবর্তনের ইতিহাস অবগত হওয়ার জন্য *চাচনামা* একটি আকরগ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়।

এই গ্রন্থে খ্রিস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর যে সমস্ত স্থানের নাম পাওয়া যায় তা পরবর্তীকালে শনাক্তকরণের মাধ্যমে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের জনপদের প্রকৃতি ও প্রকরণ সম্পর্কে ধারণা করা সহজ হয়। জাট ও মেড় জাতিসত্তা সম্পর্কে এবং তাদের দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতির ওপর সম্যক জ্ঞানলাভ করা যায়। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের ওপর অভিজাত শ্রেণীর প্রাধান্য তাদের সমাজজীবনে বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং এরই ফলশ্রুতিতে নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে অসন্তুষ্টি ধূমায়িত হতে থাকে। এইরকম পর্যায়ে মুসলমানদের আগমনকে তারা আশীর্বাদ হিসাবে গণ্য করে। মহম্মদ-বিন-কাশিমের সামরিক বিজয় জনজীবনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। তার মাহাত্ম্য ও উদারতায় জনগণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করে। তিনি স্থানীয় জনগণের মধ্য থেকে রাজস্ব আদায়ের লোক সংগ্রহ করেন ও তাদের ওপর নিজ নিজ এলাকায় শান্তি রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করেন।

চাচনামা গ্রন্থ হতে আরও জানা যায় যে, মহম্মদ-বিন-কাশিম ও তাঁর অনুগামীরা স্থানীয় জনগণকে বলপূর্বক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেননি ও তাঁর অনুগামীরা স্থানীয় জনগণকে বলপূর্বক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করেননি। বরং তাঁরা জনগণকে ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেছিলেন। এমনকি তাঁদের ধর্মশালা ও মন্দির ধ্বংস না করে সেগুলো পুনর্নির্মাণের অধিকার প্রদান করেছিলেন। বিলাধুরির 'ফুতুহ আল-বুলদানে' বর্ণনার সাথে চাচনামায় বর্ণিত ঘটনার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কাজেই প্রাথমিক পর্বের সিন্ধু ও মুলতান এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের রাজনৈতিক ও সামাজিক

Scanned with CamScanner

ইতিহাস জানার জন্য পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকরা *চাচনামা* গ্রন্থের ওপর অনেকটাই নির্ভর করেন। তবে দারুহারের ভগ্নী জানকী রাজা দাহিরের পুত্র জায়সিয়া (জয়সিংহ) সম্পর্কে যে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তা অনেকটা কল্পকাহিনির মতো মনে হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এরূপ কল্পকাহিনির সন্ধান মেলে। চাচনামায় বর্ণিত মহম্মদ-বিন-কাশিমের গো-চামড়ায় সেলাই অবস্থায় মৃত্যু অসঙ্গতিপূর্ণ ও ইতিহাসের ধারাবাহিকতার পরিপন্থী। মোটকথা, জায়সিয়ার ঘটনা ও মহম্মদ-বিন-কাশিমের তথাকথিত শোচনীয় মৃত্যুর বিষয় কল্পিত ও অতিরঞ্জিত কাহিনিরূপে বিবেচিত হয়। তবে চাচনামায় বর্ণিত বিষয়বস্তুর সার্বিক মূল্যায়নে বলা যায় যে, ভারতের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি অপরিহার্য। *চাচনামা* সম্পর্কে এই মূল্যায়নের সমর্থনে প্রফেসর জন ডাউসনের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "An air of truth pervades the whole, and though it reads more like a romance than history, yet it is occasioned more by the intrinsic interest of the subject, than by fictions proceeding from the imagination of the another"।

দেবপালের শাসনকালে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে এসেছিলেন আরবীয় পর্যটক সুলেমান ও মহীপালের শাসনকালে অল্-মাসুদি ভারত ভ্রমণ করেন। তিনি ছিলেন বাগদাদের অধিবাসী। ৯১৬ খ্রিস্টাব্দে *সিলসিলা আল তাওয়ারিখ* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের বর্ণনাকারী সিরাফের অধিবাসী আল হাসানের সাথে বসরায় অল্-মাসুদির সাক্ষাৎ ঘটেছিল এবং তিনি ভ্রমণের অনেক তথ্য অবগত হয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি মিশর, ফারস, কিরমান, সিরিয়া, আজারবাইজান, জুরজান, স্পেন, সিংহল, চীন, মাদাগাস্কার এবং ভারতীয় উপমহাদেশের মুলতান, দেবল ও মানসুরা প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। অল্-মাসুদির লেখা গ্রন্থের নাম *মুরুজ আল-যাহার*। এই গ্রন্থে তিনি বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশ এবং বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবনধারার ওপর আলোকপাত করে বস্তুনিষ্ঠ গ্রন্থ রচনা করতে সমর্থ হয়েছেন। এটি সংক্ষিপ্ত আকারে বিশ্ব ইতিহাসের ধারণা উপস্থাপিত করেছে। সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিশ্বসৃষ্টির শুরু থেকে আব্বসীয় খলিফা আল-মুতি বিল্লাহর রাজত্বকালের কিয়দংশ (আনুমানিক ৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অল্-মাসুদি সম্পর্কে Sprenger কর্তৃক উদ্ধৃত ইবন খালাদুনের মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খালাদুন বলেছেন "Al-Masudi in his book describes the state of the nations and countries of the east and west, as they were in his age that is to say, in 330-332 A.H./941-43. He gives an account of the genius and usages of the nations ; a descriptions of the countries, mountains, seas,

Scanned with CamScanner

kingdoms and dynasties, and he distinguishes the Arabian race from the Barbarians. Al-Masudi became through this work, the prototype of all historians to whom they refer, and on whose authority they rely in the critical estimate of many facts which form the subject of their labours"।

এছাড়া, তিনি উল্লেখ করেছেন ভারত একটি বিশাল দেশ যার পরিধি সাগর, স্থলভূমি এবং পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত। এর পূর্ব প্রান্তে জাভা অবস্থিত যা চীন এবং ভারতের মধ্যে সীমারেখা টেনেছে। এই দ্বীপের শাসক মহারাজ নামে পরিচিত। পর্বতমালার দিকে ভারতের পরিসীমা খোরাসান, সিন্ধু এবং তিব্বত পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। এসব অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের ভাষা ও ধর্ম পৃথক ছিল। এসব জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই পুনর্জন্মে বিশ্বাস করত। এদেশের অধিবাসী হিন্দুরা সাধারণত মদ্যপান করা থেকে বিরত থাকত এবং যারা মদ্যপান থেকে বিরত থাকত না তাদের ভর্ৎসনা করা হত। এটি তাদের ধর্মীয় কোনো অনুশাসন ছিল না, বরং এতে বুদ্ধি লোপ পাওয়ার আশঙ্কা থাকায় তা পরিহার করা বাঞ্ছনীয় ছিল। তাদের কোনো রাজার মদ্যপান প্রমাণিত হলে তিনি সিংহাসন হারাতেন। কারণ তার বুদ্ধি বিভ্রাটের সম্ভাবনা ছিল এবং সুষ্ঠুভাবে রাজ্য পরিচালনা সম্ভব হত না। অল্-মাসুদির এই বক্তব্য নিরপেক্ষতার চরম নিদর্শন। অন্য যে সব বিদেশি ভারতে পরবর্তীকালে এসেছেন তাঁদের বক্তব্যে নিরপেক্ষতার অভাব দেখা যায়। তাঁর ছিল গভীর পর্যবেক্ষণশক্তি ও সুগভীর ভ্রমণ পিপাসা। খালাদুন তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। অল্-মাসুদি ও সুলেমানের বিবরণ থেকে পালরাজাদের ও প্রতিহারদের পরাক্রম সম্পর্কে বিশেষ তথ্য জানা যায়। সুলেমান-এর প্রকৃত নাম সুলায়মান আল-তাজির ও তাঁর গ্রন্থের নাম *সিলসিলা আল-তাওয়ারিখ*। সুলেমান একজন আরব বণিক। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে পারস্য উপসাগর হয়ে ভারত উপমহাদেশ, পার্শ্ববর্তী দ্বীপাঞ্চল ও চীনে কয়েকবার ভ্রমণ করেন। এসব ভ্রমণের মধ্যে একটি তারিখ ২৩৭ হিজরি/৮৫১ খ্রিস্টাব্দ উল্লিখিত হয়েছে। তিনি এই বাণিজ্যিক পরিভ্রমণের ওপর ভিত্তি করে ভারত উপমহাদেশের তৎকালীন শাসক, জনগোষ্ঠী ও ভৌগোলিক বিবরণ দিয়েছেন। উপরন্তু তিনি চীনের শাসক ও জনগোষ্ঠীর উপরও কিছু আলোকপাত করেছেন। সুলেমান তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ভারত উপমহাদেশ ও চীন পৃথিবীর চারটি রাজা বা শাসকের সম্পর্কে অবহিত ছিল। এসব শাসকদের মধ্যে বাগদাদের শাসক বা খলিফা সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। কারণ শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঐশ্বর্য ও ধর্মীয় উদারতায় তাঁরা ছিলেন সবার শীর্ষে। দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন চীনের শাসক। তৃতীয় স্থানে ছিল রোমান শাসক। চতুর্থ স্থানে ভারতের বালহারা রাজ্যের শাসক ও যুবরাজগণের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই রাজ্যে রৌপ্য ও স্বর্ণের ক্ষুদ্র কণিকা মুদ্রা প্রচলিত

Scanned with CamScanner

ছিল। বালহারা রাজ্যের পাশেই ছিল তক্ষক নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্য। এই রাজ্যের মহিলারা অত্যন্ত ফরসা ও ভারতের মধ্যে সুন্দরী ছিল। বালহারা, জুর্জ ও তক্ষক এই তিনটি রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত ছিল রুহমী রাজ্য। এই রাজ্যটি ছিল সবথেকে শক্তিশালী।

রুহমীকে ধর্মপালের (৭৭০-৮১০ খ্রিস্টাব্দ) রাজ্যের সঙ্গে অভিন্ন মনে করে এই রাজ্যের অবস্থিতি বাংলায় নির্দেশ করা হয়েছে। সুলেমান বর্ণিত জুর্জ বলতে গুর্জর ও প্রতিহার রাজাদের বুঝায় এবং বালহারা দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট রাজা বল্লভ রায়কে নির্দেশ করে। বালহারা রাজকে রাজাধিরাজ বলা হয়। সুলেমান তাঁর গ্রন্থে ভারতের অভিজাত শ্রেণী ও সাধারণ মানুষের জীবনধারা সম্পর্কে নিখুঁত বিবরণ দিয়েছেন। সেযুগে 'সতীদাহ' প্রথা যে প্রচলিত ছিল তারও বিবরণ দিয়েছেন। ভারতীয়দের মধ্যে তখন অবাধ মেলামেশা ও যৌনাচারের ব্যাপকতা ছিল। চীনারাও আনন্দঘন ও উচ্ছ্বাসময় জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল। তারা বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিল। সুলেমানের বর্ণনা থেকে সরনদ্বীপ (সিংহল) এবং কামরূপ রাজ্যের কথা জানা যায়। এই সিংহল দ্বীপে মূল্যবান পাথর ও মণিমুক্তার পাহাড় ও খনি আছে। এই সব মূল্যবান পাথর বিদেশে রপ্তানি হত। এই দ্বীপের নারীদের বাক্‌স্বাধীনতা ও যৌন স্বেচ্ছাচারিতা অনেক বিদেশি বণিককে বিমোহিত করত। এছাড়া *কিতাব-অল-ফিরিস্ত* নামে একটি জীবনীগ্রন্থ লেখা হয়েছিল। আরেকটি এযুগের অতি মূল্যবান গ্রন্থ *কামিলাৎ তারিখ*। এই গ্রন্থে মহম্মদের বংশপরিচয় এবং মধ্য এশিয়ার অনেক তথ্য পাওয়া যায়। গ্রন্থের তারিখগুলি সঠিক। এই গ্রন্থের লেখক ইবনাল আশির। তিনি ১২৩০ খ্রিস্টাব্দে এই গ্রন্থ রচনা শেষ করেন। আবু-নাসির-বিন-উতবির লেখা *কিতাব-উল-ইয়ামিনি* এযুগের একটি মূল্যবান গ্রন্থ। যদিও গ্রন্থটি সাহিত্য হিসাবেই দেখা উচিত কিন্তু গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। গজনির সুলতান সবুক্তগিন ও সুলতান মামুদের রাজত্বকাল থেকে ১০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই ধারাবাহিক ইতিহাস এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। মামুদের প্রথম জীবন ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই গ্রন্থ তা জানতে গুরুত্বপূর্ণভাবে সাহায্য করে। রাজা জয়পালের বিরুদ্ধে তাঁর সামরিক অভিযানের বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। সার্বিক বিচারে এই গ্রন্থখানি সবুক্তগিন ও সুলতান মামুদের ভারত অভিযান ও গৃহীত পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আকর উৎস হিসাবে বিবেচিত হয়। মামুদের জীবন ইতিহাস জানার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ আবুল ফজল বৈহাকির লেখা *তারিখ-ই-মাসুদি*। তবে এখানে উল্লেখ্য বৈহাকির গ্রন্থের বিভিন্ন অংশের নাম আছে। তবে এসব নামের সমন্বয় করে বৈহাকির এই বিশাল আকারের ৩০ খণ্ডের গ্রন্থটির 'তারিখ-ই-বৈহাকি' নামকরণ সমীচীন বলে মনে হয়। এই গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে গজনির রাজাদের বিস্তৃত ইতিহাস হিসাবে গণ্য করা হয়। গজনি রাজবংশের ইতিহাস জানার জন্য এটি একটি আকর গ্রন্থ।

Scanned with CamScanner

আরবদের সমৃদ্ধ ভৌগোলিক জ্ঞান কূটনৈতিক সম্পর্ককে জোরদার করে। তাঁরা যথার্থ ভৌগোলিক জ্ঞান নিয়ে এযুগের ভারত সম্পর্কে বিবরণ অনেকেই লিপিবদ্ধ করেছেন যা ভারত ইতিহাসের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আরব ভূগোলজ্ঞ সুলেমানের বিবরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ছিলেন একজন মার্চেন্ট। তিনি প্রাথমিক পর্বের জীবন্ত ঐতিহাসিক কাজ করেছিলেন। তিনি জাহাজে পারস্য উপসাগরে যান এবং সেখান হতে চীন এবং ভারতে সমুদ্রযাত্রা করেন। এতে ৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা এবং চীন, ভারত ও আফ্রিকা সম্পর্কে বিভিন্ন দিক সুলেমানের বিবরণে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সুলেমানের পর আবু জাইদুল হাসান ভারত ও চীনে না এলেও তিনি সুলেমানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পড়ে ও নিজে অন্বেষণের তাগিদে সুলেমানের ভ্রমণবৃত্তান্তকে আরও পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জিত করেন। তিনি মাসুদির সমসাময়িক ছিলেন এবং ৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বসরায় তাদের সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁরা দুজনেই উভয়ে উভয়ের প্রতি ঋণী। তাঁদের উভয়ের বিবরণ ১৭১৮ খ্রিস্টাব্দে Abbe Renaudot অনুবাদ করেন এবং Colbert পাঠাগারে দেখতে পাওয়া যায় একটি পাণ্ডুলিপি হতে। তৃতীয় আরব ভূগোলজ্ঞ হলেন খোরদাদরাহ্। তিনি সামারাতে পোস্টমাস্টার ছিলেন ৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে। তিনি প্রাথমিক পর্বের পথ নির্দেশের বই সংকলন করেন। এই সময়ে ৯২১ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ায় নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত ইবন ফজলানের বিবরণ ও মহান অটোর দরবারে নিযুক্ত স্পেনের ইবন ইয়াকুবের বিবরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক উপাদান। আরবীয়দের ভৌগোলিক জ্ঞানের উন্মত্ততায় ভারত সম্পর্কে অনেক বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন যা এযুগের ইতিহাসকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান উপাদান। পারস্যের সেখ আবু ইশাক (৯৫১ খ্রিস্টাব্দ) মাসুদির সমসাময়িক ছিলেন। তিনি ইবন হওকল-এর সাথে সিন্ধু দেশে সাক্ষাৎ করেছিলেন। মহম্মদ আবুল কাশিম (ইবন হওকল) বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন এবং ইবন খোরদাদরাহ্-র কাজের উপর ভিত্তি করে ৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত করেছিলেন তাঁর বিশ্বখ্যাত *The Book of Ways and Provinces* নামক গ্রন্থটি। এতে ভারত সম্পর্কে বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। গ্রন্থটি *Picture of the Countries* নামে খ্যাত।

আবু আবদুল্লা মহম্মদ অল্-ইদ্রিস ছিলেন একজন স্পেনীয় মরোক্কোর আরব ভূগোলজ্ঞ। তিনি The Pliny of the East নামে অভিহিত। তিনি একাদশ শতাব্দীর শেষে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর বিশাল আকারের ভূগোলের বই *নুজহাত আল-মুস্তাক* বা ইংরেজিতে অনুবাদ *The Book of Roses* লিখেছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। এই গ্রন্থে এই সময়ের ভারতের বিবরণ পাওয়া যায়। সিন্ধু দেশে আরব শাসন সম্পর্কিত কিছু লেখা পাওয়া যায় যেগুলি খুবই তথ্যে সমৃদ্ধ। অল্-ইদ্রিস তাঁর বিবরণে সিন্ধুর দেবল, বিরূন, মানসুরা ও আলোর প্রভৃতি প্রধান অঞ্চলের নাম উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও তিনি মুলতান, মাকরান, কান্দাহার এবং

Scanned with CamScanner

অনেক অজ্ঞাত শহর ও স্থানের নাম উল্লেখ করেছেন। সিন্ধুকে ভারত থেকে আলাদা দেশ হিসাবে দেখেছেন। তিনি ভারতীয়দের সততা, ন্যায়বিচার ও কর্মনিষ্ঠার প্রশংসা করেছেন। তাঁর বিবরণ পাঠে আমরা ভারতীয় জনগোষ্ঠীর জীবনধারা সম্পর্কে অনেকটা জ্ঞাত হতে পারি। তৎকালীন যুগের ভারতে সংস্কৃতে লেখা গ্রন্থ পাওয়া গেছে। *Majumal ut Jawarikb* নামে সংস্কৃত ভাষায় লেখা বইটি আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন আবুল হাসান বিন মহম্মদ অল্-জিলি। পারসিক অনুবাদ হতে আরবদের সিন্ধুদেশ শাসনের বিবরণ পাওয়া যায়। আর একটি আরবদের সিন্ধু দেশ বিজয় সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হল *Futb ul Buldan*। এটি মনোগ্রাফ জাতীয় আরব ইতিহাসচর্চার টপোগ্রাফিক্যাল আকারে ৭৫০-৮৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত লেখা। এটি আরবদের প্রাথমিক পর্বের ইতিবৃত্ত, অল্-বিলাধুরির লেখা। তিনি সিন্ধু পরিভ্রমণ করেননি কিন্তু তিনি যে সব লেখকের উপর নির্ভর করেছেন তাদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। গ্রন্থটি *চাচনামার* সমসাময়িক। আরবদের সিন্ধু আক্রমণের তথ্য জানার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য উপাদান। তিনি ৮৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। বিলাধুরি *ফুতুহ আল-বুলদান* গ্রন্থে আরবদের প্রাথমিক নগর ও শহর বিজয়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। বিলাধুরি ভারত উপমহাদেশ পরিভ্রমণ করেননি কিন্তু খলিফা আল-মুতাওয়াস্কিনের সন্তানদের গৃহশিক্ষক হওয়ার দরুন সরকারের কাছ থেকে তথ্য গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর বিবরণে মহম্মদ-বিন-কাশিমের বীরত্ব ও একইসঙ্গে উদারতার যে দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন তা প্রশংসাযোগ্য। মাত্র আঠারো বছর বয়সে তিনি সিন্ধু বিজয় করে রাজঅন্তঃপুরবাসিনীদের ওপর কোনো অসদাচরণ করেননি, বরং তাদের প্রতি সম্মানের যে উদাহরণ প্রদর্শন করেছেন তা সেযুগে ছিল অত্যন্ত বিরল। অল্-বিলাধুরি সিন্ধু ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান, নৈসর্গিক দৃশ্য ও নদনদী সম্পর্কে যে তথ্য প্রদান করেছেন তা অত্যন্ত মূল্যবান। দু'একটি স্থানে অসঙ্গতি থাকলেও অল্-বিলাধুরি সিন্ধুর ঘটনাবলীর উপস্থাপনে একজন নির্মোহ ও সূক্ষ্মদ্রষ্টা ঐতিহাসিকের ভূমিকা পালন করেছেন।

এযুগের বিখ্যাত আরব পর্যটক আলবেরুনি এসেছিলেন সুলতান মামুদের রাজত্বকালে এবং তাঁর ভারত ভ্রমণ পর্যবেক্ষণ শক্তির অমূল্য ঐতিহাসিক দলিল তাঁর লেখা *তারিখ-ই-হিন্দ*। এই গ্রন্থটি সমকালীন ইতিহাসের এক নিরপেক্ষ দলিল। এখানে উল্লেখ্য বহু বিদেশি যুগে যুগে এখানে এসেছেন। কিন্তু জ্ঞানের ও পাণ্ডিত্যের দিক থেকে একাদশ শতাব্দীতে আগত এই আরব মনীষী আলবেরুনির মতো কোনো বিদেশি পণ্ডিত কখনও এদেশে আসেননি। তাই তাঁর বিবরণ ভারত ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থে ভারতীয় দর্শন, গণিতশাস্ত্র, ধর্ম, ভূগোল, রসায়ন প্রভৃতির এক মনোজ্ঞ বিবরণ আছে। 'ভারতবর্ষের সব আছে এদের ইতিহাস নেই'—এই বিদেশির চোখেই এটি প্রথম ধরা পড়ে। এমনকি সমসাময়িক হিন্দুধর্মকে বিচার করেছেন এক

Scanned with CamScanner

নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দ্রষ্টা হিসাবে। সুলতান মামুদের ভারত অভিযানের কথাও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

আলবেরুনি ৯৭০ খ্রিস্টাব্দে খাওয়ারিজিমের অন্তর্গত বিরুন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রায় চল্লিশ বছর ধরে ভারতে বসবাস করে ভারতবর্ষকে যা জেনেছিলেন তাতে তিনি সমগ্র বিশ্বে একজন ভারততত্ত্ববিদ হিসাবেই স্থান লাভ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর অর্ধশতাব্দী পরে বৈহাকি তাঁর সম্পর্কে বলেছেন যে তিনি ছিলেন দর্শন, গণিত ও জ্যামিতি শাস্ত্রে তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী। বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যায় তাঁর উৎকৃষ্ট গ্রন্থের নাম 'বাটাকল' এবং এটির আরবিতে অনূদিত গ্রন্থের নাম 'বাটাজল'। তিনি সংস্কৃত ভাষায় বেশকিছু আরবি গ্রন্থের অনুবাদ করেন এবং আরবিতে সংস্কৃত ভাষার দুটি অভিসন্দর্ভ অনুবাদ করেছেন। এর একটি হচ্ছে 'সাঙ্ক' বা বিদ্যমান বস্তুর উৎসস্থল ও গুণাগুণ আলোচনা করে এবং অপরটির হল 'পতঞ্জলি' যা মানুষের দৈহিক খাঁচার বন্ধন থেকে আসার মুক্তিলাভের পথনির্দেশ করে। এদুটি রচনায় ভারতীয়দের ধর্মীয় বিশ্বাসের মূলনীতি অনুরণিত হয়েছে। আলবেরুনি খ্রিস্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীর ভারত সম্পর্কে যে তথ্য প্রদান করেছেন তাতে তাঁর মুক্ত মন ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। একদেশদর্শী মনোভাব পরিহার করে নির্মোহভাবে তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে তিনি ইতিহাসচর্চার গতিপথ যেভাবে প্রদর্শন করেছেন তা উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত হয়েছে। এই মহামনীষীর ১০৩৮ খ্রিস্টাব্দে মহাপ্রয়াণ ঘটে।

হাসান নিজামি রচিত *তাজ-উল-মাসির* এযুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক উপাদান। এই গ্রন্থে ১১৯৩-১২২৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লির সুলতানি আমলের প্রাথমিক পর্বের ঘটনাবলী নিখুঁতভাবে লেখা হয়েছে। এটি প্রথম শ্রেণীর উপাদান হিসাবে বিবেচ্য। তাছাড়া তিনি ছিলেন সমকালীন ঐতিহাসিক।

মিনহাজ-উস-সিরাজ-এর লেখা *তাবাকৎ-ই-নাসিরী* গ্রন্থ ঐতিহাসিক তথ্যের দিক থেকে First hand Account হিসাবে বিবেচ্য। মহম্মদ ঘুরির ভারত আক্রমণ ও ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ার খলজির লক্ষ্মণসেনের আমলে বাংলা বিজয়ের ঐতিহাসিক তথ্য জানা যায় এই গ্রন্থ থেকে। যদিও গ্রন্থের রচনাকাল থেকে ১২৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ইতিহাস রচনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত ঘটনা, স্থান ও তারিখ ঐতিহাসিকদের কাছে যথার্থ বলে স্বীকৃত। তাই তাঁর গ্রন্থের রচনাকালের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। ইংরেজিতে এই গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন র‍্যাভারটি। তিনি শুধু সমসাময়িক ছিলেন না, বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিচার বিভাগের উচ্চপদে আসীন ছিলেন। যদিও গ্রন্থটিতে ইসলামীয় জগতের ইতিহাস সাধারণভাবে আলোচিত হয়েছে, তবুও ১২৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লির সুলতানি যুগের ধারাবাহিক ইতিহাস এতে পাওয়া যায়।

Scanned with CamScanner

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে লিপি ও মুদ্রা দুটিই গুরুত্বপূর্ণ আদিমধ্য যুগের ক্ষেত্রে দুটিই গুরুত্বপূর্ণ না হলেও এযুগের অসংখ্য লিপির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য এযুগের মুদ্রা অল্পসংখ্যক পাওয়া গেলেও তার গুরুত্ব কম নয়। কারণ ঐতিহাসিকরা মনে করেন এযুগে মুদ্রার প্রচলন হ্রাস পেয়েছিল এবং অর্থনৈতিক সঙ্কট ঘনীভূত হয়েছিল। বিশেষ করে পাল, প্রতিহার, চালুক্য, রাষ্ট্রকূটদের মুদ্রার পরিচয় নেই বললেই চলে। তবে দাক্ষিণাত্যের পরবর্তী চালুক্য, কোল, কলচুরি, পাণ্ড্য পল্লবদের যে মুদ্রাগুলি পাওয়া গেছে তা সে যুগের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য। তাছাড়া দক্ষিণ পূর্ব বাংলা ময়নামতীর খননকার্যের ফলে যে আরবীয় 'দিনার' পাওয়া যায় তা বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের সাক্ষ্য বহন করে। যেগুলি পাওয়া গেছে সেগুলি থেকে সাহিত্যিক ও পৌরাণিক উপাদানের সত্যতা যাচাই-এর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ সাল, তারিখ, নিরপেক্ষ ও বিশেষ কোনো রাজার রাজত্বকালের গ্রামাণ্য তথ্য মুদ্রা থেকে পাওয়া যায়। তাই আদিমধ্য যুগের ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত মুদ্রাগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

এযুগের প্রাপ্ত লিপিগুলির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। ভারতের বিভিন্ন স্থানে এযুগের লেখ পাওয়া গেছে। পাল, প্রতিহার, চোল, সেন, রাষ্ট্রকূট রাজাদের অনেক লিপি পাওয়া গেছে। হর্ষবর্ধনের নালন্দা লিপি, চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল প্রশস্তি, রাজা ভোজের গোয়ালিয়র লিপি, পাল রাজাদের খালিমপুর লিপি এবং বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপি এযুগের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে। অবশ্য এগুলি প্রশস্তি লিপি। স্বভাবতই এগুলিও সতর্কতার সঙ্গে পাঠ করতে হয়। রাজাদের প্রবর্তিত লিপি ছাড়া বেসরকারি সূত্রে প্রচারিত প্রায় ১৫০০ লিপি পাওয়া গেছে। এগুলি থেকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস বিশেষ করে শিল্প, ভূমি আইন সংক্রান্ত বিষয়, বণিক ও রাজস্ব এবং এযুগের সাংস্কৃতিক বিষয়ে তথ্য জানা যায়। তাম্রপত্রগুলিও এযুগের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

গুপ্ত পরবর্তীযুগের লেখমালাগুলি ব্রাহ্মী ও তামিল ভাষায় রচিত। এগুলি কখনো মন্দির গাত্রে বা কখনো সম্পূর্ণ পৃথকভাবে রচিত হত। তবে এযুগের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ লেখ হল তাম্রশাসনগুলি। এগুলি থেকে আদিমধ্য যুগের একদিকে কৃষি অর্থনীতি এবং অপরদিকে ভূমিব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। এমনকি কৃষি ও কৃষকের অবস্থা জানতেও সাহায্য করে। এযুগের 'অগ্রহার' ব্যবস্থার পরিচয়ও তাম্র-শাসন লিপিগুলি থেকে আমরা পাই। লেখগুলিতে সংস্কৃত ও তামিল এবং অন্যান্য স্থানীয় ভাষাকে ব্যবহার করা হয়েছে। এই লেখগুলি থেকে রাজার রাজ্যারোহণ, শাসনকাল, কীর্তিকাহিনি, সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। আবার সাহিত্য হতে প্রাপ্ত তথ্যগুলির সত্যতা যাচাই-এর ক্ষেত্রে লেখগুলি অনবদ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

Scanned with CamScanner

লেখগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়। সরকারি ও বেসরকারি। সরকারি লেখকে দুভাগে ভাগ করা যায়—প্রশস্তিমূলক ও ভূমিদান সম্পর্কিত লেখ। প্রশস্তিগুলি হল রাজার সভাকবি দ্বারা অতিরঞ্জিত প্রশংসামূলক লেখ। যেহেতু সভাকবি বেতনভুক কর্মচারী সেহেতু এই লেখগুলি অনেক সময় পক্ষপাতিত্বের দোষে দুষ্ট। তাই ঐতিহাসিকরা মনে করেন প্রশস্তিমূলক লেখগুলি খুব সাবধানে গ্রহণ করা উচিত। তবে এগুলি হতে রাজার বংশ পরিচয়, রাজ্য জয় ও রাজ্যসীমা, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় পাওয়া যায়। আগেই বলেছি ভূমিদান সম্পর্কিত তাম্রশাসনগুলির গুরুত্বের কথা। তাম্রশাসনগুলির গুরুত্ব এযুগের ইতিহাসে অপরিসীম। প্রকৃতপক্ষে তাম্রশাসনগুলি জমি ক্রয়-বিক্রয়ের দলিল। যিনি ভূমি দান করেছেন তাঁর নাম এবং যিনি দান গ্রহণ করেছেন তাঁর নাম পাওয়া যায়। জমি বা গ্রামের বিবরণ পাওয়া যায়। কৃষি অর্থনীতির চিত্র তাম্রশাসনগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে। এর গুরুত্ব অপরিসীম। অপরদিকে তাদের রাজত্বকালের পরিচয় পাওয়া যায়। আরো বহু লেখ আছে যা থেকে চোল রাজাদের সামুদ্রিক সাম্রাজ্য বিস্তার ও তাদের রাজত্বকালের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রকৃতপক্ষে এযুগের ইতিহাসের উৎকীর্ণ লিপি বা Epigraph হতে সমকালীন রাজবংশের ধারাবাহিকতা ও অর্থনৈতিক অবস্থা জানতে মুদ্রা ও লিপি সবিশেষ সাহায্য করে। যদিও এই স্বল্প পরিসরে সামগ্রিকভাবে লিপির আলোচনা সম্ভব নয়। Epigraphia indo-Moslemica, Epigraphia Carnetica, Epigraphia India প্রভৃতি এলবামে এযুগের বহু লিপির ছবি সব প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিকগণ এযুগের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান করতে পেরেছেন। এগুলি লিপিচর্চার ইতিহাসের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলার পাল, সেন, প্রতিহার, চোল রাজাদের অনেক লেখ পাওয়া গেছে। যেমন চালুক্য রাজের *আইহোল প্রশস্তি*, উমাপতিধর রচিত *দেওপাড়া প্রশস্তি*, ভোজের *গোয়ালিয়র প্রশস্তি* প্রভৃতি। গোয়ালিয়র লেখ হতে প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্টের কীর্তিকাহিনির কথা জানা যায়। *দৌলতপুর তাম্রশাসন* থেকে প্রথম ভোজের কর্তৃত্বের ইতিহাস জানা যায়। সেনরাজাদের দেওপাড়া প্রশস্তি হতে সেন রাজা বিজয়সেনের কীর্তিকাহিনি জানা যায়। *খালিমপুরের তাম্রশাসন* থেকে পাল বংশের প্রতিষ্ঠা ও ধর্মপালের কর্তৃত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া তাঁর রাজত্বকালীন *নালন্দা তাম্রশাসন* ও পাহাড়পুরে প্রাপ্ত সিলমোহর থেকে নানা তথ্য পাওয়া যায়। দেবপালের *নালন্দা তাম্রশাসনটিও* অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক উপাদান। নারায়ণপালের ভাগলপুরের তাম্রশাসন লেখটিও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে সমৃদ্ধ। তাঁর *মুঙ্গের তাম্রশাসন* লিপিও এযুগের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে।

মালদহে প্রাপ্ত মহেন্দ্রপালের তাম্রশাসনটি পালবংশের ইতিহাসের পুনর্নির্মাণে বিশেষভাবে সাহায্য করে। এই তাম্রশাসন থেকে মহেন্দ্রপালের কৃতিত্ব সম্পর্কে

Scanned with CamScanner

অবহিত হওয়া যায়। প্রথম মহীপালের *বাণগড় লেখ* থেকে পাল সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধারের ইতিহাস জানা যায়। প্রথম মহীপাল পাল সাম্রাজ্যকে যে রক্ষা করেছিলেন সে তথ্য এই লেখ থেকে পাওয়া যায়। *জাজিলপাড়া তাম্রশাসন* পালরাজা দ্বিতীয় গোপালের কীর্তিকাহিনি বহন করে। রামপালের রাজত্বকালের তথ্য জানার ক্ষেত্রে *তেত্রাবন মূর্তি লেখ, চন্ডী মূর্তি লেখ, আরমা মূর্তি লেখ* প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পাল রাজ তৃতীয় গোপালের রাজত্বকালের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় *রাজীবপুর লেখ* থেকে। রাজীবপুর তাম্রশাসন থেকে মদনপালের রাজত্বকালের পরিচয় পাওয়া যায়।

দক্ষিণ ভারতে রাষ্ট্রকূট ও চোলদের বহু লেখ পাওয়া গেছে যেগুলি এযুগের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে। এই স্বল্প পরিসরে সে আলোচনা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রকূটদের লেখর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ লেখ হল *রাধানপুর লেখ, দৌলতাবাদ লেখ, বরোদা লেখ, সুরাট লেখ, সাজন লেখ, সমনগড় লেখ* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই লেখ থেকে রাষ্ট্রকূট রাজাদের ইতিহাস জানা যায়। দক্ষিণ ভারতে চোলদের অজস্র লেখ পাওয়া গেছে। চোল রাজা প্রথম পরান্তক-এর দুটি *উত্তীর মেরু* লেখ পাওয়া গেছে। তা থেকেই তদানীন্তন চোল রাজাদের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। চোলরাজা রাজেন্দ্র চোলের *তিরুমালেই লেখ* থেকে তাঁর কীর্তিকাহিনির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম রাজরাজের *তিরুবেঙ্কাড়ু, মাদুরান্ততম, তিরুবেদিবুদু, তিরুক্কোকালু, তাঞ্জোর লেখ* এবং প্রথম রাজেন্দ্র-এর বিখ্যাত *তিরুবালঙ্গাড়ু, তিরুবেরুম্বেয়ুর* প্রভৃতি লেখ থেকে তাদের সামুদ্রিক বিজয়ের কাহিনি জানা যায়।

প্রকৃতপক্ষে আদিমধ্য যুগের ইতিহাসের উৎকীর্ণ লিপি বা Epigraph হতে সমকালীন রাজবংশের ধারাবাহিকতা ও অর্থনৈতিক অবস্থা জানতে লিপি ও মুদ্রা আমাদের সবিশেষ সাহায্য করে। এগুলি বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিকরা এযুগের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান করতে পেরেছেন। এগুলি লিপিচর্চার ইতিহাসের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আর মুদ্রাচর্চার ক্ষেত্রে 'Chronicles of Pathan Kings of Delhi' নামক অ্যালবামে এডওয়ার্ড টমাস সুলতানি যুগের মুদ্রা সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তা এযুগের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এযুগের মুদ্রাগুলি থেকে রাজার বংশপরিচয়, ব্যক্তিগত রুচি, সিংহাসনে আরোহণকাল, রাজ্যসীমা, রাজার ধর্ম প্রভৃতি বিশেষ ঘটনাবলী আমাদের জানতে সাহায্য করে। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান হিসাবে মন্দির, মসজিদ, প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, মনুমেন্ট প্রভৃতি ইতিহাসের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আবার দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলির তথ্য ও সঙ্গম সাহিত্যের তথ্য থেকে অর্থনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এই ঐতিহাসিক তথ্যগুলি আদিমধ্য যুগের ইতিহাস রচনায় প্রাণসঞ্চার করে।

Scanned with CamScanner